পাপের পরিণাম।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর-প্রণীত।

Calcutta:
PRINTED AND PUBLISHED BY THE
METCALFE PRESS.
76 Balaram Dey Street.
1906.

মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

"পাপের পরিণাম" পল্লীচিত্র। কিছুকাল পূর্ব্বে ইহা "পূর্ণিমা" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইল। চিত্রে নূতনত্ব কিছুই নাই। বঙ্গের পল্লীগ্রামে অনেকস্থলে যেরূপ চরিত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাই দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। অঙ্কনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি সহৃদয় পাঠক এবং সমালোচকবর্গ তাহার বিচার করিবেন।

চুঁচুড়া,
৩রা কার্ত্তিক, ১৩১৩। } শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

পাপের পরিণাম।

প্রথম অধ্যায়।

প্রণাম, আস্‌তে আজ্ঞা হ'ক্। দেবতার নিবাস?—

নিবাস ভট্টপল্লী। হরিহর দেবশর্ম্মা, ভট্টাচার্য্য।

তামাক দে রে, পা ধোবার জল এনে দে।

১২—সালের ফাল্গুন মাসের প্রথমে একদিন বেলা প্রহরেক অতীত হইলে, মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশস্থিত কোন পল্লীগ্রামে রামসুন্দর সামন্তের বাড়ীতে ভাটপাড়ার হরিহর ভট্টাচার্য্য উপস্থিত হইলে, গৃহ-স্বামী তাঁহাকে এইরূপ অভ্যর্থনা করেন। রামসুন্দর জাতিতে কৈবর্ত্ত। বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, হরিহর তদপেক্ষা অধিক বয়স্ক; কিন্তু উভয়ের আকৃতি দেখিলে রামসুন্দরকে বয়োজ্যেষ্ঠ বোধ হইবে। রামসুন্দরের আদেশে ভৃত্য তামাকু এবং পা ধুইবার জল আনিয়া দিল।

ব্রাহ্মণ তামাক্ খাইতে খাইতে গৃহস্বামীর সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন।

"আপনার সহিত আমার পূর্ব্বে কখনও সাক্ষাৎ ঘটে নাই। এ বাড়ীতে আমি অনেক বার আসিয়াছি। আপনি কর্ম্মস্থলেই থাকিতেন।"

রাম। আজ্ঞা, হাঁ, আমি কর্ম্মস্থলেই থাকিতাম। দাদার মৃত্যুর পর চাকরী ছাড়িয়া দেশে আসিয়াছি। এখন আর বাড়ীতে না থাকিলে চলে না।

হ। ঈশ্বরেচ্ছায় আপনাদের যা আছে, তা'তে চাকরী করাই নিষ্প্রয়োজন।

রা। দাদা থাক্‌তে ত আর সংসারের কিছুই আমাকে দেখতে হয় নাই, কাজেই বাইরে থাক্‌লে চল্‌ত। তা'তেই চাকরী।

হ। আপনি ত নারায়ণপুরের কাছারীর নায়েব ছিলেন?

রা। আজ্ঞা হাঁ।—তেল এনে দে রে।

হ। ব্রহ্মোত্তরের কিছু খাজানা পেয়ে থাকি।

রা। আজ্ঞা, আচ্ছা। আহারাদি করুন, তারপর নিলেই হবে, এ মাসের ক'দিন না এলে আমিই পাঠিয়ে দিতুম। দাদা সব টুকে রেখে গেছেন—এক কপর্দ্দক কারও গোল হবার যো নাই।

হ। তিনি বড় হিসেবি লোক ছিলেন।

রা। যান, স্নান আহ্নিক সমাপন করুন।

ব্রাহ্মণ স্নান আহ্নিক সমাপন করিয়া দেখেন, সিদার বন্দোবস্ত অতি পরিপাটী। রামসুন্দরের অগ্রজ থাকিতে যেরূপ আয়োজন হইত, রামসুন্দর তদপেক্ষা অনেক অধিক আয়োজন করিয়াছেন। ভক্তি শ্রদ্ধাও যেন অনেকটা বেশী। ব্রাহ্মণ যতক্ষণ রন্ধনে নিযুক্ত ছিলেন, রামসুন্দর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ছিলেন। রামসুন্দরের পরিধান এক খানা

পট্টবস্ত্র, হস্তে একটি তুলসীর মালা। রামসুন্দর জপের চিহ্ন মুখ নাড়িতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে মালা টপ্ টপ্ করিতেছেন। হরিহর ভট্টাচার্য্যের রন্ধন শেষ হইয়াছে; তিনি ভোজনে বসিবেন, এমন সময়ে অন্দর হইতে একজন ভৃত্য আসিয়া রামসুন্দরকে কহিল—"যায়গা হয়েছে, আসুন।"

রামসুন্দর অত্যন্ত রোষ প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"যা ব্যাটা নচ্ছার, দেবতার সেবা হয় নাই—আমি যাব খেতে।"

ভৃত্য। আজ ত জলও খান নাই, বেলা প্রায় শেষ হয়।

হরিহর কহিলেন,—"যান্, আপনি খেতে যান্, আমার ত হয়েছে।"

রা। এমন আদেশ করিবেন না। ব্রাহ্মণ অভুক্ত থাক্‌তে আমি খাব! ও ব্যাটা বেল্লিক—কাণ্ডজ্ঞানহীন।

হ। ব্রাহ্মণে ভক্তি আপনাদের বংশানুযায়িনী।

রা। আজ্ঞে আঁা—আঁা—আঁা—(রামসুন্দর দেখাইলেন যেন তিনি অতিশয় লজ্জিত হইয়াছেন)।

ব্রাহ্মণের আহার হইল, রামসুন্দরও আহার করিলেন। উভয়ে ক্ষণকাল বিশ্রামও করিয়াছেন।

অপরাহ্ণে হরিহর কহিলেন,—"তা' হ'লে খাজানাটা দিয়ে দিলে আমি উঠ্‌তে পারি।"

রা। আজ আর কোথায় যাবেন।

হ। না, যেতে হবে। শীঘ্র বাড়ী ফিরবার দরকার। আজ এখান থেকে বিদায় হ'লে, রাজপুর পর্য্যন্ত যেতে পারি। কাল এগোব দক্ষিণ মুখে।

রা। আপনাদের ব্রহ্মোত্তর না আছে কোথায়?

হ। সেই বাপ দাদারা যা ক'রে রেখে গেছেন—এখন আর হবে না।

রা। এখন দেবার লোক কোথায়? আর কি সেকালের রাজা রাজড়া আছেন?

হ। তা ত বটেই।—

কথা বাড়িয়া যায় দেখিয়া, হরিহর এই সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়াই পুনরায় কহিলেন—"তা হ'লে খাজানাটা দিয়ে দিলে—"

রা। হাঁ—এই কাগজটা দেখেই দিচ্ছি। এক বৎসরের খাজানা পাওনা ত?

হ। হাঁ, দেখুন লেখা আছে ১৭।৵০ সতের টাকা সাত আনা।

রামসুন্দর (কাগজ বাহির করিয়া) মহিষাদল ৩১৩৲ পাথরঘাটা ৫১৪।৵০ ইত্যাদি অনেকগুলি বাজে আওড়াইয়া, শেষে কহিলেন,—"এই যে আপনাদের নাম, আপনার নামও আছে মারফত লেখা। কি পোক্ত কাজ, রামযাদব ভট্টাচার্য্য কার নাম?"

হ। তিনি আমার প্রপিতামহ, ব্রহ্মোত্তর তাঁরই নামে।

রা। কত বল্‌ছিলেন খাজানা?—

হ। ১৭।৵০ সতের টাকা সাত আনা।

রা। বলেন কি? এ ত মেলে না; দেখ্‌তে পাচ্ছি ৪।/১৫। দেখি আর কোন জমা আছে কি না।

হ। সে কি, একই জমা আমাদের—আর কোন জমা নাই।

রা। (কাগজ দেখিয়া) না দেখ্‌তে পাই না ত।

হ। ভুল হয়েছে নিশ্চয়ই। আমিই খাজানা নিয়ে যাচ্ছি আজ বিশ বৎসর হবে।

রা। আজ্ঞে,—দাদাত আমার কাঁচা লোক ছিলেন না।

হ। তা ত জানি; তাঁর সঙ্গে কোন দিন দু কথা হয় নাই, এমন ভুলটা কেন ক'রে গেলেন? তাঁর লেখা ঠিক ত?

রা। লেখা তাঁর হাতের নয় বটে, কিন্তু তিনি নিজ মুখে বলে যান, আর ঐ গোপাল, আমাদের মহুরের, সেই লিখে নেয়। কই কারও ত এমন গোল হয় নাই।

হ। কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।—দাখিলা আছে ত ঘরে, দেখুন ত দু চারি বছরের দাখিলা—তা হলে টের পাবেন।

রা। আমার বোধ হয়, আপনারই ভুল হচ্ছে। অনেক গ্রামে ব্রহ্মোত্তর আপনাদের। আর কার জমা ১৭।৶০ তাই আমাদের সঙ্গে গোল করেছেন।

"না, তা কি হতে পারে," বলিয়া হরিহর তাঁহার বুচকী হইতে এক কাগজ বাহির করিলেন এবং দেখাইলেন, লেখা রহিয়াছে শ্যামসুন্দর সামন্ত, রামসুন্দর সামন্ত ১৭।৶০।

রা। তাইত, এত ভারি গোলের কথা।

হ। গোল কি? আপনি দাখিলা দু চারি খানা আনুন না।

রা। দাখিলার বাক্সের চাবি দাদার স্ত্রীর কাছে, তিনি কাল বাপের বাড়ী গেছেন।

হ। তা হলে আর কি হবে?

রা। এই খাজানাটাই নিয়ে যান বরং। আর আপনার প্রণামী কিঞ্চিৎ।

হ। প্রণামীতে কি হবে? আপনার কথা শুনেই আমার প্রাণ চম্‌কে গেছে। খাজানার কড়ি, একদিন দু দিনের নয়, চিরকালের।

রা। তা ত বটেই।

হ। আপনাদের জমি কতটা জানেন? ৫০/ বিঘার কম নয়।

রা। ব্রহ্মোত্তর জমির খাজানা কমই হ'য়ে থাকে। অনেক ব্রাহ্মণ আবার আদৌ পানই না।

হ। হাঁ তেমনও আছে।—তা'হ'লে আর কি হবে, আমি উঠি।

রা। খাজানা নেবেন না?

হ। নি কেমন ক'রে, এর একটা নিষ্পত্তি না হলে? আপনি বাক্সের চাবিটে আনিয়ে দাখিলা ক চারি খানা বের করে দেখ্‌বেন, আমি কাঁথি অঞ্চল থেকে ফেরবার সময় আর একবার আস্‌ব।

রা। আজ্ঞে আচ্ছা- ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর তার এক পয়সা খাজানা কম দেব এমন ইচ্ছা রাখি না। তবে দাদার কাগজে ত কারও ভুল লেখা নাই।

হ। কি জানি, কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লে'ম না।

হরিহর উঠিলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি কেবল এই এক কথাই ভাবিতে লাগিলেন। শ্যামসুন্দর সামন্ত কেন এমন ভুল করিলেন, ইহার কোনই সন্তোষ-জনক মীমাংসা তিনি করিয়া উঠিতে পারিলেন না। রামসুন্দরের যেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা দেখিয়াছেন, তাহাতে তাহার যে কোনরূপ প্রতারণা আছে, ইহা তাঁহার মনেই আসিল না।
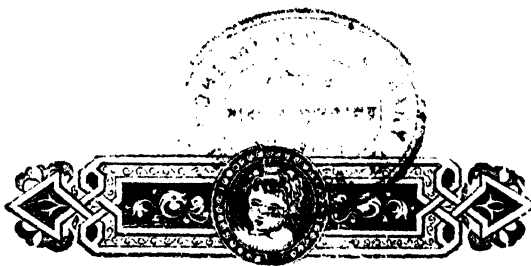
দ্বিতীয় অধ্যায়।

রামসুন্দরের পরিচয়ের নিমিত্ত অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। বক্ষ্যমাণ উপন্যাসের নিমিত্ত যাহা জানা আবশ্যক, তাহা প্রায় পূর্ব্বাধ্যায়েই উক্ত হইয়াছে। সোনাদিয়া গ্রামে তাঁহার বাড়ী। তাঁহারা দুই সহোদর ছিলেন। জ্যেষ্ঠ শ্যামসুন্দর বাড়ীতে থাকিতেন। রামসুন্দর নারায়ণপুরে জমিদারের কাছারীর নায়েব ছিলেন। ইঁহারা মধ্য-শ্রেণীর কৈবর্ত্ত। মেদিনীপুর জেলায় কৈবর্ত্ত জাতির সম্মান কম নহে। উচ্চ শ্রেণীর কৈবর্ত্তেরা অধিকাংশই প্রাচীন রাজবংশ সম্ভূত, অথবা ঐরূপ বংশের সহিত সম্পর্কিত। কালের পরিবর্ত্তনে এখন ইঁহারা অনেকেই নিঃস্ব, সুতরাং গণনীয় নহেন। কিন্তু ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বাঙ্গালার বর্ত্তমান বহু সম্ভ্রান্ত বংশের পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষা সমধিক ক্ষমতাশালী ও সম্মানিত ছিলেন। মধ্যশ্রেণীর কৈবর্ত্তেরা বিশেষ সম্মানিত না হইলেও সাধারণতঃ চাকরি অথবা ব্যবসায় কর্ম্ম করেন। হলচালন ইত্যাদি কর্ম্ম করেন না। রামসুন্দর দিগের জমি জমাও বেশ ছিল।

হরিহর চলিয়া গেলেই রামসুন্দর গোপালকে ডাকিলেন। গোপালের নাম পাঠক পূর্ব্বেও একবার শুনিয়াছেন। গোপাল এক কৈবর্ত্ত রমণীর গর্ভের কৃষ্ণপক্ষের সন্তান। মেদিনীপুর জেলায় জার-গামিনী বিধবার সন্তানেরা পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলেই আপনাদিগকে কৃষ্ণপক্ষ বলিয়া পরিচয় দেয়। ঐ জেলায় কৃষ্ণপক্ষের এই অর্থ সকলেই জানে। গোপাল নারায়ণপুরে রামসুন্দরদিগের ভৃত্য এবং পাচক ছিল। তিনি তাহাকে সামান্য লেখা পড়াও শিখাইয়াছিলেন। কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আসিবার সময়ে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনেন। গোপাল আসিলে রামসুন্দর চারি দিকে চাহিয়া অন্য কাহাকেও না দেখিয়া কহিলেন—"শুনেছ কিছু ?"

গো। আজ্ঞে না।

রা। বামুণের জমা টাকায় সিকি রেখেছি। ১৭।৵০ আনার যায়গায় একবারে ৪।৴১৫। এখন চাই কতকগুলো দাখিলা। ওরা বছরে একবার ক'রেই খাজানা নেয়। তুমি আগা গোড়া দাখিলা গুলি তয়ের করবে। কাগজ আমার কাছে যথেষ্টই আছে।

গো। তা দেখেছি।

রা। যে গুলো বেশী পুরোণো, সেই গুলোয় গোড়ার দাখিলাগুলি, আর ক্রমে শক্ত কাগজগুলিতে হালের দাখিলাগুলি লিখ্‌বে। আমি সব দেখিয়ে দিব। হাত আছে বেশ তোমার।

গো। তা পারিব।

রা। এক খানা পাট্টার চেষ্টা করা যা'ক। সেই রাম যাদব ভট্টাচার্য্যের নামে এই কম জমা দিয়ে পাট্টা এক খানা করতে পারলে খুবই কাজ হয়।

গো। তা পারা যাবে না কেন ?

রা। দেখ সেটা হয় ভালই, না হয় দাখিলা দিয়েই কাজ সারিব। নালিস এই বারই করবে। এত কম খাজানা কিছুতেই নেবে না। আদালতে বিশ বছরের দাখিলা এক রকম দেখাতে পাল্লেই হল। কিন্তু দাখিলা গুলো কর্ত্তে হবে, বামুণ ফিরে আসতে আসতে। দশ পনের দিনের কম ফিরে আসতে পাচ্ছে না। তুমি কাল থেকেই লেগে যাও।

গো। আজ্ঞে আচ্ছা।

রা। নাম টাম দাখিলার পাঠ অন্য যত কিছু সব ঠিক রাখবে, কেবল টাকার অঙ্কটা বদলাতে হবে আর "মবলক"টা—

গো। তা বুঝেছি। কাল থেকেই আরম্ভ ক'রব।

রা। হাঁ—? আসুন আসতে আজ্ঞা হয়।

গ্রাম্য পুরোহিত বরদা কান্ত চক্রবর্ত্তী আসিয়া উপস্থিত ; রামসুন্দর তাঁহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়াই অভ্যর্থনা করিলেন এবং ব্রাহ্মণ নিকটস্থ হইলে, পদধূলি গ্রহণ করিয়া বসিতে আসন দিলেন। মালা টপ্ টপ্ কিছু শীঘ্র শীঘ্র চলিতে লাগিল।

বরদা কান্ত বলিলেন—"গেছলুম মণ্ডলদের বাড়ী, মনে কল্লাম ঘর যাবার সময়ে একবার আপনার সঙ্গে দেখাটা করে যাই।"

রা। আসবেনইত। রোজই একবার এসে পায়ের ধূলাটা দিবেন।

ব। কাজের ঝঞ্ঝাট অনেক। মধু বাবুর ওখানে আর আপনার এখানে একবার আসাত আমার নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে।

রা। কেমন দেখলেন মধু বাবুকে ?

ব। উনি ত চিররোগীর মধ্যে গেছেন। চক্ষুম একেবারেই হয় না।

রা। ছেলে বাড়ীতে না ?

ব। হাঁ এসেছে কা'ল। ছেলেটি বিগড়েছে। হিন্দুধর্ম্মে আস্থা

নাই। কোথাকার এক বিধবার বিবাহ দেবার যোগাড় কচ্ছে। কলি-কাল, "নাস্তি ধর্ম্ম কলৌ কালে।"

রা। হা ভগবান্, কালে কালে কতই দেখ্‌তে হ'ল। ভাগ্যে দাদার মেয়েটি বে হ'তে হ'তেই মারা গেছিল, তা নইলে, জামাইএর এই আচরণ দেখ্‌লে, তিনি আপনার গলায় আপনি ফাঁসি দিতেন।

ব। তা ঠিক। তাঁর মত হিন্দু আজকাল দেখা যায় না। দেবতা ব্রাহ্মণে অমন ভক্তি! আর সাক্ষাতে বলা নয়,—আপনি তাঁকেও ছাড়িয়ে উঠেছেন।

রা। (সলজ্জ ভাবে হাত যোড় করিয়া) আজ্ঞে—আপনাদের আশীর্ব্বাদ আর পায়ের ধূলোর জোরে, তাই যা বলেন। আজকাল যে দিন প'ড়েছে, তা'তে হিন্দুর ছেলে হিন্দুর আচরণ বজায় রা'খলে তা'তেও যেন বাহাদুরী।

ব। তা'ত বটেই। ক'টা লোক এখন খাঁটী হিন্দু মেলে? মধু মণ্ডলের ব্যাটা—সেই কিনা বলে যে, অল্প বয়সে বিধবা হ'লে, তার বে দিতে দোষ নাই। চিরকাল ওদের বাড়ীতে বিগ্রহ। বার মাসে তের পার্ব্বণ। নিত্য অতিথিসেবা, ব্রাহ্মণ ভোজন। আজ কালই না হয় প'ড়ে গেছে।

রা। ইংরাজী শিখ্‌লেই যেন ধর্ম্মের প্রতি আস্থা কমিয়া আসে। আমার ইনিও ত কলিকাতায় গেছেন, কি যে হ'য়ে আসেন, ভগবান জানেন।

ব। না আপনার ছেলের হবে না। আপনার শাসন আছে। মধু বাবুর স্ত্রী মারা যাওয়াতেই, ছেলেটা বিগড়েছে। একমাত্র সন্তান, ভাল বাসা অতি বেশী; কখনও উঁচু কথাটি কন নি।

রা। তার ফল এখন ভুগছেন আর কি।

ব। তা'ত বটেই—আপনার ছেলের অমন হওয়া অসম্ভব।

রা। হ'লে কি আমি সে ছেলের মুখ দেখ্‌ব?—মধু বাবু গ্রামের মাথা, প্রাচীন, আমাদের ওঁকে উপদেশ দেওয়া সাজে না। ছেলেকে একটু কড়্‌কে দিলে, ছেলে ত ছেলে—ছেলের চৌদ্দ পুরুষ ব'সে প'ড়বে না?

ব। আজ কালকার ছেলেরা তেমন নয়। তবে মধু বাবু শাসন কোন দিনই করেন নাই। যে ভালবাসা। ছেলেরও পিতৃভক্তি আছে, আর লেখা পড়ায় বেশ, এই বয়সে বি. এ পাস দিয়েছে।

রা। জোর সেইটুকুখানি। মোদ্দা, মধু বাবু নাই দিয়েই মাটি ক'রেছেন। ব্রাহ্মণে যার ভক্তি নাই, তেমন ছেলে আস্ত পুঁতে ফেলে দেওয়া উচিত। কেউ কেউ বলছিল আবার আমার মেয়েটিকে ঐ ছেলের সঙ্গে বে দিতে—যে তা'হ'লে সম্পর্কটা বজায় থাক্‌ত। অমন সম্পর্ক উঠে গেছে সেই ভাল।

ব। যাই সন্ধ্যার সময় হল—

রা। হাঁ তা' হ'লইত—প্রণাম।

ব্রাহ্মণ উঠিয়া গেলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বরদাকান্ত উঠিয়া যাইতেই, রাম সুন্দরের পেয়াদা আবদুল সেথ ভজহরি দাস নামে এক আসামীকে আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। ভজহরি এক শীর্ণকায় বৃদ্ধ কৈবর্ত্ত। রামসুন্দরের বাড়ী হইতে তাহার বাড়ী অর্দ্ধ মাইল দূরে। সে রামসুন্দরের প্রজা এবং খাতক। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সে রামসুন্দরের অগ্রজের নিকট হইতে চারি মন ধান্য কর্জ্জ করিয়া খাইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত ১২৶ মন ধান দিয়াছে। কিন্তু রামসুন্দরের হিসাবে এখনও পাওনা ১৮।৫ আঠার মন পনর সের। তাহাই আদায়ের জন্য ভজহরির তলব হইয়াছে। ভজহরির অবস্থা অতি শোচনীয়, তাহার একমাত্র পুত্র কলিকাতায় কাজ করিত; ছয় মাস হইল সে সেখানে বিসূচিকা রোগে হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ভজহরি এবং তাহার বৃদ্ধা স্ত্রীর অতি কষ্টে দিন যাইতেছে। ভজহরি সম্মুখে আসিবামাত্র রামসুন্দর কহিলেন,—"কি ভজহরি ধানের কি ?"

ভ। আজ্ঞে আর আমার দেবার সঙ্গতি নাই। যা দিয়েছি, তাহাতেই আমাকে রেহাই দিন।

রা। রেহাই টেহাই হচ্ছে না। সহজে দেবে কি না বল।

ভ। দেবার শক্তি থাক্‌লে দিতাম। ব্যাটা না ম'লে যা চাইতেন দিতাম।

রা। যা চাইতেন কি? ভিক্ষে চাইছি তোমার কাছে? চারি দেড়ে ছয়, ছ' দেড়ে নয়, ন' দেড়ে সাড়ে তের। সাড়ে তের দেড়ে সওয়া কুড়ি। সওয়া কুড়ি মণের দেড়ে হ'ল—ত্রিশ মণ পনের সের। এর মধ্যে উসুল কেবল ১২/ মণ, ১৮৷৫ আঠার মণ পনর সের বাকী। পনের সেরই না হয় ছেড়ে দিলাম। আঠার মণের কি?

ভ। আজ্ঞে আঠার মণ ছেড়ে আঠার সেরও আমার দেবার সাধ্য নাই।

রা। শালা, ন্যাক্‌রা পেয়েছ নাকি? আবদুল, ধান আদায় কর্‌, ধান আদায় কর্‌।

শেষের কয়েকটি শব্দ রামসুন্দরের মুখ হইতে ব্যাঘ্র গর্জ্জনে বাহির হইল। সঙ্গে সঙ্গে একটু সুর নরম করিয়া মুখবিকৃতির সহিত কহিলেন— "ব্যাটা মরেছে, তবেই আর কি, শালার সব দেনা শোধ হয়ে গ্যাছে— ব্যাটাত কারু মরে না।"

অল্পকাল মধ্যেই আবদুল প্রভুর আদেশ প্রতিপালনে অগ্রসর হইল। বঙ্গের পল্লীগ্রামের অভিজ্ঞতা যাহাদের কিঞ্চিন্মাত্র আছে, তাঁহারাই বুঝিবেন, আদায় করিতে বলার অর্থ কি।

অতিশয় নির্দ্দয় প্রকৃতির লোক না হইলে অত্যাচারী ভূস্বামী বা মহাজনের পেয়াদা কিংবা নগদীর কার্য্য করিতে পারে না। ভাল মানুষ হইলে সে এইরূপ আদেশের অর্থ না বুঝিয়া অনেক সময়ে স্বয়ং প্রভুর হাতে প্রহার খাইয়া থাকে। আবদুল সে শ্রেণীর নহে। জমিদারী কাছারীতে—সে রামসুন্দরের অধীনে নগ্‌দী ছিল। কাজের লোক

বলিয়াই রামসুন্দর তাহাকে বাড়ীতে আনিয়াছেন। প্রভুর গর্জ্জন শুনিয়াই সে বৃদ্ধকে মারিতে আরম্ভ করিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভজহরি শীর্ণকায়। তাহার শ্বাস রোগ ছিল। আবছলের হাতের প্রহার সে সহ্য করিতে পারিবে কেন? দু এক ঘা খাইয়াই বৃদ্ধ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। রামসুন্দর হুকুম দিলেন,—"শালাকে সামনে থেকে সরা। নে যা পুকুরে, এখনই ধান আদায় হবে।"

আবদুল তৎক্ষণাৎ তাহাকে লইয়া গেল, এবং পুকুরে নাবাইয়া গলা অবধি ডুবাইয়া দিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ফাল্গুন মাসের প্রথমভাগ, সুতরাং শীত ছিল। বৃদ্ধ ভজহরি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; আর কেবল এক একবার কাতরকণ্ঠে সেই দরিদ্রদুঃখহারী পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিল। দু'একবার আবদুলকে অনুনয় করিয়া কহিল,—"আমার ঘরে একটা খবর দাওনা।" আবদুল তাহাতে কান না দিয়া বলিল,—"শালা ধানের পথ কর্। বল্ এখনি বাড়ী যেয়ে গরু টরু বেচে দিবি, তা হলে কর্ত্তাকে বলি।"

ভ। তা আছে একটা গাই, তাই বেচেই দেব। এ কষ্ট আর সহ্য হয় না।

এই সময়ে ভজহরির স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। আবদুল ভজহরিকে বেলা থাকিতেই আনিয়াছিল। বরদাকান্ত চক্রবর্ত্তী ছিলেন বলিয়া সে সময়ে রামসুন্দরের সম্মুখে হাজির করে নাই। সন্ধ্যার পরেও স্বামী ফিরিল না দেখিয়া, বৃদ্ধা রামসুন্দরের বাড়ী মুখে আসিতেছিল। পথে খবর পাইয়াছে যে, রামসুন্দরের আদেশে ভজহরি প্রহার খাইয়া পুকুরের জলে নাবিয়াছে। রমণী অমনি রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছে। রামসুন্দর বাহিরের ঘরে বসিয়া মালাই টিপিতেছেন। ভজহরির স্ত্রী প্রথমেই

পুকুরধারে আসিল, এবং আবদুলকে কহিল,—"বাপ আমার, বুড়োকে ছেড়ে দাও। আমি কর্ত্তাকে যেয়ে বল্‌ছি।"

আবদুল তাহা শুনিবে কেন? বৃদ্ধা একবার স্বামীকে তুলিতে গেলে, আবদুল অতি কর্কশ ভাষায় জানাইয়া দিল, যে এরূপ চেষ্টা করিলে তাহাকেও অবমানিত হইতে হইবে।

রমণী উপায়ান্তর না দেখিয়া রামসুন্দরের কাছে দৌড়াইল, এবং তাহার চরণ প্রান্তে ধুপ্‌ হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "এই কি বিচার, কর্ত্তা? বুড়ো হাঁপানিতে মরো মরো। যা ছিল, ব্যাটার শোকেই সেরে দিয়েছে। সেই লোককে দিয়েছেন পুকুরে নাবিয়ে?"

রা। সর্। সর্। ছুঁবি?

ভ—স্ত্রী। বুড়োরে খালাস দেও।

রা। ধান গুলি দিলেই খালাস দি।

ভ—স্ত্রী। দেবার শক্তি কি আছে আমাদের?

রমণী এইবার রামসুন্দরের পায়ে ধরিতে গেল। রামসুন্দর সরিয়া বসিয়া চেঁচাইলেন,—"মর, মাগী, হারামজাদী"।

ভজহরির স্ত্রী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কহিল—"কর্ত্তা, ছাড় বুড়োরে, এ শীতে বাঁচবে না।"

রা। ধান দে এনে।

ভ—স্ত্রী। কোথায় পাব? বাবা রামতনু, একবার উঠে আয় বাবা!

বৃদ্ধা মৃত পুত্রের উদ্দেশে কাঁদিতে লাগিল।

রা। শালী আবার কান্না সুরু করে দিল। ইচ্ছে হয় গরু টরু বেচে ধানের দামটা দিয়ে বুড়োকে খালাস করে নিয়ে যা।

ভ—স্ত্রী। থাক্‌বার মধ্যে একটা গাই আছে, তাই নিলে আপনি খুসী হন্‌, নিন্‌।

রা। খুসী কি শালি? আমি মাগ্‌তে যাচ্ছি তোমার কাছে?

ভ স্ত্রী। কর্ত্তা আনিয়ে নাও সে গরু, দাও বুড়োকে ছেড়ে।

এতক্ষণে আবদুলের প্রতি হুকুম হইল,—"ভজহরিকে জল হইতে তুলে আন্"।

বৃদ্ধা স্বামীর কাছে দৌড়াইল এবং ভজহরি উঠিলে, আপনার অঞ্চল দিয়া তাহার সমস্ত গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিল। ভজহরির গাত্র বস্ত্র সহিতই আবদুল তাহাকে জলে ডুবাইয়া ছিল। বৃদ্ধ আর্দ্র বস্ত্রে থাকিলে দারুণ ক্লেশ পাইবে বলিয়া রমণী একটু দূরে, লোক-চক্ষুর অন্তরালে, যাইয়া আপনার অঞ্চলাংশ পরিধান করিল, এবং কথঞ্চিৎ নিজের লজ্জা নিবারণ করিয়া শুষ্ক ভাগের অনেকটা ছিঁড়িয়া লইল। ভজহরির কাপড় ছাড়াইয়া সেই টুকু পরাইলেও, তাহার শীত বারণ হইল না। বৃদ্ধা কতকগুলি শুষ্ক পত্র সংগ্রহ করিল, এবং তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া, স্বামীকে উত্তাপ দিতে লাগিল।

ভজহরি বসিলে, রমণী তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় মারিয়াছে?"

ভজহরি কাঁদিতে কাঁদিতে প্রহারের স্থান দেখাইয়া দিল। বৃদ্ধা হস্ত দ্বারায় সেই সকল স্থান মর্দ্দন করিয়া দিতে লাগিল।

স্বামীর সেবা করিতে করিতে রমণী তাহাদের একমাত্র সম্বল গাভীটির কথা ভুলিয়াই গিয়াছিল। সহসা রামসুন্দরের এক ভৃত্য আসিয়া বলিল,—"এই যে তোমার গরু এনেছি, ধানের দেনা মিটিয়ে যাও।"

বৃদ্ধ দম্পতীর চেতনা হইল। গাভীটিকে তাহারা বড়ই ভালবাসিত। তাহারা যে গৃহে শুইত, তাহারই এক পার্শ্বে গাভীটি থাকিত। গাভীটির ক্রোড়ে ছ' সাত মাসের একটি বৎস। তাহাই শুদ্ধ টানিয়া আনিয়াছে। ভজহরির স্ত্রী সন্ধ্যার সময়ে গাভীটিকে গৃহে তুলিয়া, সেখানে

ঘুটের ধূম করিয়া, রাখিয়া আসিয়াছিল। এখন যাইয়া গৃহের সেই অংশ শূন্য দেখিতে হইবে। রমণী মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সমস্ত ভাবিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে, কাঁদিয়া ফল নাই ভাবিয়া, বৃদ্ধ স্বামীকে সঙ্গে লইয়া রামসুন্দরের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

গাভীটি পাঁচ সের করিয়া দুধ দেয়। তাহার মূল্য ১৮৴ মণ ধানের মূল্য অপেক্ষা অনেক অধিক। কিন্তু অতি সহজেই নিষ্পত্তি হইল যে, ঐ ১৮৴ মণ ধান্যের জন্য গাভীটি যাইবে। ভজহরি কিংবা তাহার স্ত্রী কোন আপত্তি করিল না।

ভজহরি স্ত্রীকে কহিল,—"আর দেরী কর কেন? চল ঘর যাই।" ভজহরির স্ত্রী উঠিল, এবং শিশিরসিক্ত এক গুচ্ছ দক্ষা আনিয়া গাভীটির মুখে দিল। কিছু কাল তাহার কান, মুখ, পায়ের খুর প্রভৃতিতে হাত বুলাইল এবং বাছুরটিরও গাত্র স্পর্শ করিল। অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, -"মা ভগবতি, এত দিন আমার ঘরে ছিলে। আজ বিদায় দিলাম মা! ব্যাটা মরবার পর থেকে তুমিই আমাদের বাঁচিয়েছ মা। তোমার দুধ বেচে চা'ল কিনেছি মা। তোমার গোবর দিয়ে ঘুঁটে বানিয়ে ভাত রেন্ধে খেয়েছি মা। কত অযত্ন করেছি, কত মেরেছি তোমায় মা--অপরাধ নিওনা মা, জন্মের শোধ ঘাস খাইয়ে গেলাম মা।

পুত্রশোকদগ্ধ দরিদ্র-দম্পতী হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া গৃহাভিমুখে চলিল। রজনীর অস্পষ্ট আলোকে যতদূর তাহাদিগকে দেখা গেল, গাভীটি কাতর-নয়নে পালক-পালিকার পানে চাহিয়া রহিল।

পশু, তোমারও প্রাণ আছে! কিন্তু মানুষ কেমন করিয়া এমন প্রাণহীন হয়, ইহাই আমরা বুঝিতে পারি না।

চতুর্থ অধ্যায়।

রামসুন্দরের ভ্রাতৃবধূ পিত্রালয়ে। তাঁহার একটি মাত্র কন্যা ছিল। কন্যাটির মৃত্যুর পরে আর তাঁহার সংসারে আসক্তি নাই। রামসুন্দরের বাড়ীতে এখন রামসুন্দরের স্ত্রী, এক পুত্র এবং একটি কন্যা। পুত্রটি বড়। কন্যাটি ছোট। বৃদ্ধ ভজহরির প্রতি যে পীড়ন হইয়াছিল, রামসুন্দরের স্ত্রী সে সংবাদ পাইয়াছেন। তিনি রামসুন্দরের উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী ছিলেন না। স্বভাবতঃ হিন্দুললনা যাহা হইয়া থাকেন, তাহাই ছিলেন। আধুনিক শিক্ষা তাঁহার ছিল না; কিন্তু মোটামুটি বঙ্গগৃহের গৃহিণীর কর্ত্তব্য তিনি জানিতেন। পুত্রবতী রমণীর হৃদয়ে পরদুঃখ-কাতরতা ছিল। তাই ভজহরির প্রতি অত্যাচারের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রাণে আঘাত লাগিল।

রামসুন্দর বাড়ীর ভিতরে আসিয়া আহার শেষ করিলে, তিনি আস্তে আস্তে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"হাঁগা, ঐ পাড়ার এক কেশো বুড়োকে ধরিয়ে এনে নাকি মেরেছ ?"

রামসুন্দর। তোমার কাছে এ সব খবর এনে দেয় কে ?

গৃহিণী। যেই দি'ক্, সত্যি তাকে কি আবতুল মেরেছে ?

রা। সে কথায় তোমার কাজ কি ? যাও, খেয়ে এস।

গৃ। না বল্লে আমি খাব না।

রা। মেরেছে ত মেরেছে। ধান পাওনা ছিল, তাই দেয় নি ব'লে একটু কড়্‌কে নিয়েছিল।

গৃ। এর নাম কি কড়্‌কে নেওয়া ? বুড়োকে এই শীতের রাত্রে জলে ডুবিয়েছ !

রা। না ডুবুলে যে ধান আদায় হয় না।

গৃ। কাজ কি অমন ধান আদায়—ক'রে।

রা। সে পরামর্শ যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করি, তখন দিও। এখন খেয়ে এসে শোও।

গৃ। আমার খাওয়ার জন্য আস্‌ছে যাচ্ছে কি ? তুমি অমন ক'রে লোক মারতে পার্ব্বে না। নারায়ণপুরের কাছারিতে বুঝি অমনই ক'রে মানুষকে মার্ত্তে ?

রা। মার্ত্তাম ত মার্ত্তাম।

গৃ। যদি মেরে থাক, আর মেরো না। গরীব দুঃখী হাড়ে কেটে শাপ দেয় ; আর ওতে পরমেশ্বরও নারাজ হন।

রা। রেখে দাও তোমার পণ্ডিতত্ব। মেয়ে মানুষের মুখে শাস্ত্র জ্ঞান ভাল লাগে না।

গৃ। আমি শাস্ত্রের কথা বল্‌ছি না। আমার মনের কথা বল্‌ছি। নিজের ছেলে মেয়ে হয়েছে। পরের প্রাণে ব্যথা দিও না। ওদের অমঙ্গল হবে। আর মানুষের অমন গা'ল কুড়ুলে জপ তপ পূজার্চ্চনা সবই মিথ্যা।

রা। মিথ্যে হ'ক সত্যি হ'ক, সে আমি বুঝি। মেয়ে মানুষের অত জ্যাঠামোয় কাজ কি? মেয়ে মানুষ খাবে দাবে থাক্‌বে; বস্।—

রামসুন্দর চটিয়াছেন। গৃহিণী পূর্ব্বাপেক্ষা সুর নরম করিয়া আরম্ভ করিলেন;—"আমি কি কখনও তোমার সঙ্গে জ্যাঠামো করেছি? তবে সে বুড়ো বুড়ীর কিছুই নাই, থাক্‌বার মধ্যে একটা গরু, আর তার বাছুর; তাই তুমি এনেছ!"

রা। না আন্‌লে যে ধান আদায় হয় না।

গৃ। অমন লোককে না হয় ধান ছেড়েই দিতে।

রা। তোমার যখন এত দয়া, তখন তুমি তাদের হ'য়ে ধানগুলি দিয়ে দাও না কেন? তাদের গরু তা'রা নিয়ে যাক্।

গৃ। তা দিলে ছেড়ে দাও? আমি তোমার ধানের দাম এখনই দিচ্ছি।

রা। কোথা থেকে টাকা দেবে? যা দেবে, সে টাকা কি আমার নয়?—করে এনেছ বুঝি?

রামসুন্দর একটি জঘন্য শব্দ প্রয়োগ করিলেন—স্বামীর শেষ কথায় সরলা রমণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। আর উত্তর দিবার ক্ষমতা রহিল না। মনে মনে তিনি ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন, আর কহিতে লাগিলেন,—"জগদীশ্বর, আমার স্বামীকে সুমতি দাও। যাতে লোকের প্রতি অন্যায় অত্যাচার না করেন, এমন বুদ্ধি দাও।"

ক্ষণকাল পরে অৰ্দ্ধস্ফুটস্বরে যেন অন্যমনস্ক ভাবে কহিয়া উঠিলেন—"ও গরুর দুধ আমি আমার ছেলে মেয়েকে খেতে দিচ্ছি না।"

রামসুন্দর অবসর বুঝিয়া উত্তর দিলেন,—"তা নাই দিলে। ও দুধ আমি ঠাকুর ঘরে আর অতিথ ঘরে দেবো।"

গৃহিণী সে রাত্রিতে আহার করিলেন না। সধবার পক্ষে রাত্রিতে

নিরম্বু উপবাস করা কর্ত্তব্য নহে বলিয়া, তিনি যৎকিঞ্চিৎ জলপান করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। পরদিন প্রভাতে গৃহকর্ম্ম সমাপনান্তে তিনি ভজহরির স্ত্রীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বৃদ্ধা আসিলে, নানা উপায়ে তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন। ভজহরির স্ত্রীর বস্ত্রের অভাব জানিতে পারিয়া তিনি তাহাকে একখানি ব্যবহারোপযোগী পুরাতন বস্ত্র দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি তণ্ডুল ও কিছু তরকারী দিয়া কহিলেন---"মা, তুমি আমার মার বয়েসী। যত কিছু অপরাধ, আমার হয়েছে। তুমি আমার ছেলে পিলেকে গা'ল দিও না। যখন তোমার কষ্ট হয়, আমার কাছে এসো। আমি যা পারি দেবো। গোপাল আর আব দুলই ওঁয়ার মতিচ্ছন্ন ঘটায়েছে। ও দুটোকে সঙ্গে ক'রে এনে কি অন্যায়ই করেছেন।"

"ওমা আবদুলের নাম করো না, মা" বলিয়া বৃদ্ধা কাঁদিয়া উঠিল। এবং আপনার অঙ্গের ছিন্ন বস্ত্র দেখাইয়া পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনা বিবৃত করিতে লাগিল। রামসুন্দরের স্ত্রী তাহাকে থামাইয়া, নানাকথা কহিয়া, বিদায় দিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

এদিকে পরদিনই রামসুন্দর, গ্রাম্য পুরোহিত বরদাকান্তকে ডাকাইলেন, এবং পুনরায় সং প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন। এই সময়ে গ্রামে দুই একটি লোকের বসন্ত রোগ হইতেছিল। রামসুন্দর কহিলেন—"আমার বিবেচনায় মা শীতলা দেবীর অর্চ্চনা করা উচিত। গ্রামের সকলের নিকট হইতে কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া পূজার উদ্যোগ করা যা'ক্। আপনাকেই সব ভার নিতে হবে। পূজাটি যা'তে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, সেইটি দেখ্‌বেন। টাকার জন্য তত ভাবনা নাই। গ্রামের লোকে যা দেয় দেবে, বাকি আমি দেব।"

বরদাকান্ত বলিলেন,—"অতি উত্তম প্রস্তাব করেছেন।"

রা। হিন্দুর কাজই ত দেব দেবীর অর্চ্চনা; আর দেখুন আমার বিশ্বাস যে, এই সব অমঙ্গল ব্যারাম স্যারাম কেবল দেবতার কোপেই হয়। তাঁদের কোপের শান্তি না হ'লে যা'ই করুন, কিছুতেই কিছু হবার নয়।

ব। ঠিক কথা বলেছেন। আজকালকার দিনে বড় একটা এ রকম কথা শুনতে পাওয়া যায় না।

রা। আপনাদের আশীর্ব্বাদে বয়সটাই ত বিদেশে বিদেশে কাট্‌লো। এখন দেশে এসেছি, দু' একটু ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান না কর্‌লে জীবনই বৃথা। পাপমুখে আগে বলাটা ভাল দেখায় না, মনে ক'রেছি এইবার বৈশাখ মাসে (হস্তস্থিত মালাটা কপালে ছোঁয়াইয়া) 'কথা' দেব। যে সময় পড়েছে, কথা টথা দেওয়াও দেশ থেকে উঠে গেল। ভগবানের নাম শুন্‌তেই যেন মানুষের আলস্য।

বরদাকান্ত। বড়ই সাধু সঙ্কল্প। বৈশাখ মাসে কথা দেওয়া, আর ব্রাহ্মণ ভোজন।

রা। আজ্ঞে হাঁ তাও মনে করেছি, দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন—মাসের কয়েক দিন ধরেই করাব। কি জানেন, সংসারে কেবল নিজের উদরের চিন্তা ত পশুরাও করে।

ব। উত্তম উত্তম। পুণ্য মাসে নিত্য ব্রাহ্মণ ভোজন, আর ভগবদ্‌-গুণ কীর্ত্তন। এর উপর আর কথা আছে?

রা। সবই আপনাকে ক'রে কম্মে নিতে হবে।

ব। তা পারিব। আর একলা আমিই কেন, গ্রামের সব লোকই দেখবে শুন্‌বে।

রা। তা ত বটেই। পাড়াগাঁয়ের গুণই এটি। একজন একটি কাজ আরম্ভ কর্‌লে, দশ জনে এসে খাটে; ঠিক যেন আপনার বাড়ীর কাজ। বড় যায়গায় এমনটি হবার যো নাই। সেখানে পরের বাড়ীতে যেয়ে কাজ কর্ম্ম দেখা শুনা—লোকে অপমানের বিষয় মনে করে।

ব। তা ঠিক। ক্রমে কিন্তু পাড়াগাঁয়েও সেই ভাবটা হ'য়ে আসছে।

রামসুন্দর এবং বরদাকান্তে এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময়ে গ্রামের ত্রিলোচন দাস সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ত্রিলো-

চনকে গ্রামের আপামর সাধারণ সকলেই ভালবাসিত। ত্রিলোচন একজন প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু ছিলেন। ত্রিলোচনের প্রচলিত নাম ‘হরিবলা’। তাহার কথার মাত্রা ছিল “হরিবলে”। তিনটি কথা কহিতে গেলেই তিনি একটি হরিবলে লাগাইতেন।

ত্রিলোচন আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হরিবলে কি কথা হচ্ছে?”

বরদাকান্ত উত্তর করিলেন,—“রামসুন্দর বাবু কথা দেবেন, আর ব্রাহ্মণ খাওয়াবেন, বৈশাখ মাসে, তাই বল্‌ছিলেন।”

ত্রিলোচন রামসুন্দরের দিকে তাকাইয়া কহিলেন,—“বাবু, হরিবলে কথাই দেন, আর ব্রাহ্মণই খাওয়ান, হরিবলে জীবের প্রতি দয়া না রাখ্‌লে সবই মিথ্যা হরিবলে।”

রা। এ কথার অর্থ কি? (মালা টিপিতে টিপিতে)—হরিবোল হরিবোল।

ত্রি। হরিবলে কাল রাত্রে এই কেশো রোগী ভজহরিকে হরিবলে জলে ডুবিয়েছেন শুনলাম। হরিবলে তার প্রাণটায় তখন কি বলেছে?

রা। তা ব’লে কি পাওনা গণ্ডা সবই ছেড়ে দিতে হবে?

ত্রি। হরিবলে তা বল্‌ছিনে, তবে যার যেমন শক্তি, হরিবলে সেটাও দেখ্‌তে হয়। নিরর্থক হরিবলে মানুষকে কষ্ট দিলে তাতে পাপ আছে। হরিবলে বুড়ো বুড়ী যে কান্না সুরু করেছে—

রা। পাওনাটি ছেড়ে দিলে আর কাঁদত না।

রামসুন্দর অপ্রস্তুত হইতেছেন দেখিয়া অপদার্থ বরদাকান্ত তাঁহার সমর্থনার্থ দু’এক কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

“তা ও লোকের ধরণই ঐ। নেবার বেলায় খুব সুড় বুড়। দেবার বেলায় যত কান্নাকাটি। উপুড় হস্ত করিতে গেলেই লোকের যেন কেমন লাগে। আর একটু কড়কে আদায় কল্লেই, তা নিয়ে কত কথা হয়।”

ত্রি। ঠাকুর থামো না হরিবলে। খোষামুদে কথা বলা ভাল নয়। হরিবলে সে ভজহরি তোমারই বা কে, আর আমারই বা কে? বাবুর সঙ্গেই হরিবলে কার শক্রতা? তবে কিনা হরিবলে চারি মণ ধান খেয়ে বার মণ দিয়েছে। হরিবলে আর সে পুত্রশোকে জর জর, ব্যারামে মরো মরো, হরিবলে। একটা গাই ছিল, হরিবলে তারই দুদ্ টুকু বেচে হরিবলে চল্‌ত বুড় বুড়ীর। কা'ল বাবু সেটিও নিয়ে এসেছেন হরিবলে। এখন হরিবলে তাদের এমন দশা হয়েছে, যে দেখ্‌লে পথের লোকে কাঁদে হরিবলে।

বলা বাহুল্য, রামসুন্দর এবং সঙ্গে সঙ্গে বরদাকান্ত উভয়েই ত্রিলোচনের কথায় বিরক্ত হইলেন। কিন্তু ত্রিলোচনের প্রতি লোকের ভক্তি অসীম। ত্রিলোচন মিথ্যা কথা বলিবার লোক নহেন, ইহা সকলেই জানে। বরদাকান্ত এবং রামসুন্দরের তাহার বাক্য খণ্ডন করিবার সাহস হইল না। তাঁহারা উভয়েই চটিয়া গেলেন। ত্রিলোচন আর সেখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই দেখিয়া উঠিয়া চলিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ক্রমে ক্রমে রামসুন্দরের অত্যাচার গ্রামে অপ্রতিহত-ভাবে চলিতে লাগিল। দুর্ব্বলের শোণিত শোষণ করিয়া তিনি আপনার অর্থ বাড়াইতে লাগিলেন। ভজহরির ন্যায় অনেক দরিদ্র তাঁহার পেষণে সর্ব্বস্বান্ত হইল। কে তাঁহার বিরুদ্ধে কথা কহিবে? রামসুন্দর দুর্ব্বল দেখিয়াই পীড়ন করিতেন। সংসারে দুর্ব্বলের জন্য অতি অল্প লোকেই কাঁদিয়া থাকে। বিশেষতঃ রামসুন্দর গরু মারিয়া ব্রাহ্মণকে জুতা দান করিতে জানিতেন। গ্রামের অনেকেই তাঁহার বাড়ীর ক্রিয়া কাণ্ডে আসিয়া যোগ দিত, এবং উদর পূরিয়া আহার পাইত; সুতরাং ভজহরির ন্যায় দরিদ্রের কথা মনে আসিলেও কেহ তাহা উত্থাপন করিত না। পুলিশ থানা—গ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ দূরে। আদালত, ফৌজদারী কাছারি একদিনের পথ ব্যবধান। ইহাতে রামসুন্দরের অত্যাচার করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। পুলিশ কিছু কিছু পার্ব্বণী পাইত। কাজেই রামসুন্দরের বিরুদ্ধে একটি কথাও কহিত না।

রামসুন্দরের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে গ্রামে কেবল দুইটি লোক ছিলেন—এক ত্রিলোচন দাস, আর মধু মণ্ডল।

ত্রিলোচনের পরিচয় পাঠক পূর্ব্বাধ্যায়েই কিঞ্চিৎ পাইয়াছেন। ত্রিলোচনকে গ্রামের লোকে বড়ই শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। ত্রিলোচনের সম্পত্তির মধ্যে বিঘা পঞ্চাশেক জমির এক জোত। ইহা দ্বারাই তিনি অনেক বিপন্নের সাহায্য করিতেন। অতিথি আসিলে—ত্রিলোচনের বাড়ী হইতে কখনই ফিরিত না। গ্রামের অন্য লোকে পথিক প্রভৃতি আশ্রয়প্রার্থীকে ত্রিলোচনের বাড়ী দেখাইয়া দিত। ত্রিলোচনের সংসারে আর কেহই নাই, তাঁহার স্ত্রীর কাল হইয়াছে। সন্তান সন্ততি হয় নাই। কিন্তু দেশের সকলেই যেন তাহার কুটুম্ব। ত্রিলোচন একটি বিশ্বস্ত ভৃত্যকে বাড়ীতে রাখিয়া, অধিকাংশ সময় এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, এবং কেহ কষ্টে পড়িয়াছে দেখিলেই, প্রাণপণে তাহার কষ্ট দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। এই কারণেই ভজহরির বৃত্তান্ত এত শীঘ্র তাঁহার কানে গিয়াছিল। ভজহরি সস্ত্রীক ত্রিলোচনের বাড়ীতেই রহিয়াছে।

নিকটস্থ আট দশ খানি গ্রামের লোকে ত্রিলোচনকে দেবতার ন্যায় সম্ভ্রম করিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ত্রিলোচন সাধারণতঃ হরিবলা নামেই পরিচিত। এমন কি বালক এবং অধিকাংশ যুবকেরাও তাহার যে হরিবলা ভিন্ন অন্য নাম আছে, ইহা জানিত না। বৃদ্ধেরা তাহাদের পুত্রগণকে শিখাইত "হরিবলাকে সম্মান করিও"। তিনি যেখানে যাইতেন, সেইখানেই তাঁহার আদর। সর্ব্বাপেক্ষা শিশুরা তাঁহাকে অধিক ভাল বাসিত। ত্রিলোচনে শিশুর সারল্য ছিল। ত্রিলোচন কোন বাড়ীতে— গেলেই অল্প বয়স্ক বালকবালিকাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিত, কেহ কোলে উঠিত, কেহ বা কান্ধে চড়িত। প্রতিবেশীদিগের পুত্র কন্যাগণ অনেক সময়ে তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া নানারূপ আব্‌দার, অত্যাচার করিত। তাঁহার বাড়ী তাহারা নিজের বাড়ী বলিয়া ভাবিত। ত্রিলো-

চনের গরুর দুধে বা গাছের ফলে শিশুদিগের এক চেটিয়া অধিকার ছিল। এক কথায়, ত্রিলোচনের শত্রু ছিল না। নিকটস্থ দু'চারি গ্রামে কোন বিবাদ বাধিলে, উভয় পক্ষ বলিত, হরিবলা যাহা নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন, তাহাতেই আমরা সম্মত। কোন বিষয় তাঁহার জানা থাকিলে দুই পক্ষই তাহাকে সাক্ষী মান্য করিত। ত্রিলোচন কিন্তু সাক্ষ্য দিতে বড়ই নারাজ ছিলেন। সাক্ষ্য দিবার সম্ভাবনা হইলে, প্রায়ই তিনি পলাইয়া ফিরিতেন। এ পর্যান্ত কেহই তাঁহাকে কাছারিতে লইয়া যাইতে পারে নাই।

ত্রিলোচনের জমিতে যে ধান হইত, তদ্দ্বারা তিনি অনেক দরিদ্রকে সাহায্য করিতেন। যে বৎসর তাঁহার ধান কিছু অধিক হইত, সে বার তিনি প্রায়ই একটি মহোৎসব দিতেন। ত্রিলোচনের মহোৎসবের অর্থ দুঃখী এবং কাঙ্গালী ভোজন। দুঃসময়ে কেহ তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলে, কখনই বিফলমনোরথ হইত না। এ হেন সাধুস্বভাব ত্রিলোচন কিন্তু রামসুন্দরের শত্রু বলিয়া গণ্য হইলেন। আর হইলেন মধুমণ্ডল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মধু বুনিয়াদি ঘরের সন্তান। এখন অবস্থা খারাপ হইয়া থাকিলেও রামসুন্দর অপেক্ষা গ্রামে তাঁহার সম্মান অধিক। মধু প্রায়ই বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হন না, কেন না তাঁহার শরীর সুস্থ নহে। তথাপি গ্রামের অনেক লোকই তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকে।

যে দিন সন্ধ্যার সময় ভজহরির প্রতি অত্যাচার হয়, তাহার পর দিনই একথা মধু বাবুর কানে গিয়াছিল। ইহার পর বরদাকান্ত চক্রবর্ত্তীর সহিত দেখা হইলেই, মধু ঐ কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেন এবং কহিলেন,— "রামসুন্দর বাবুকে বলিবেন, গরীবের প্রতি—এমন উৎপীড়ন না করেন। অমন লোকের শাপ হাড়ে হাড়ে লাগে।"

বরদাকান্ত এই কথাই রামসুন্দরকে একটু বক্রভাবে ঘুরাইয়া বলিয়াছিলেন। রামসুন্দর, মধু এবং ত্রিলোচন উভয়ের প্রতিই খড়্গ-হস্ত হইলেন। ভাবিলেন, ইহাদিগকে দমন করিতে না পারিলে সুবিধা নাই। সে বিষয়ে পরামর্শ চলিতে লাগিল। রামসুন্দরের সহায় গোপাল। রামসুন্দর এবং গোপালের পরামর্শের যে ফল হইয়াছিল, পাঠক পরবর্ত্তী কয়েকটি অধ্যায়ে তাহা জানিতে পারিবেন।

সপ্তম অধ্যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ত্রিলোচন সাক্ষ্য দিতে বড়ই নারাজ। আদালতের নামেই তাঁহার ভয় ছিল। ত্রিলোচন কখনও আদালতে যান নাই। যে দিন তিনি ভজহরি এবং তাহার স্ত্রীকে আশ্রয় দেন, তাহার তিন মাস পরেই কিন্তু ত্রিলোচনকে আদালতে যাইতে হইল। সে যাওয়া সাক্ষী স্বরূপে নহে, কিন্তু এক মোকদ্দমার প্রতিবাদী হইয়া। ত্রিলোচনের বাস-গ্রামের চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক স্থানের এক ব্যক্তি তাঁহার নামে ৯০০৲ টাকার দাবিতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে। কাঁথির মুন্সেফীতে এই মোকদ্দমা। যে ব্যক্তি এই নালিশ করিয়াছে, ত্রিলোচন বলেন, তাহার সহিত জীবনে কোন দিন তাঁহার পরিচয় নাই। আর তিনি কখনও কাহারও নিকট কোন টাকাও ঋণ করেন নাই। মোকদ্দমার সমন পাইয়াই ত্রিলোচন স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার মুখে সংবাদ শুনিয়া গ্রামের অনেক লোকও স্তম্ভিত হইল। অনেকে অনুমান করিল, ভুলক্রমে সমন জারি করিয়াছে। ত্রিলোচনের ন্যায় লোকের নামে কেহ মিথ্যা মোকদ্দমা করিতে পারে, এ কল্পনাতেও অনেকে বিস্মিত।

নিরূপিত দিনে ত্রিলোচনকে কাঁথির আদালতে উপস্থিত হইতে হইল। ত্রিলোচনের মনের ধারণা, তিনি যাহা কহিবেন, বিচারক তাহাই

বিশ্বাস করিবেন। ইহাও তাহার বিশ্বাস ছিল যে, মোকদ্দমাই তাঁহার নামে নহে। কিন্তু এ বিশ্বাস এবং ধারণা অধিক কাল টিকিল না। ত্রিলোচন টাকা লওয়া বা বাদীর সহিত পরিচয় থাকা অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করিলেও মোকদ্দমার তাহাতেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল না। বাদী এবং প্রতিবাদীর প্রমাণ গ্রহণ করিবার জন্য দিনান্তর ধার্য্য হইল। ত্রিলোচনের উকীল তাঁহাকে প্রমাণ আনিতে কহিলে, ত্রিলোচন কহিলেন,—"এর আবার প্রমাণ কি আনিব? ওরাই যেন প্রমাণ ক'রে যায়।"

বিচারের দিনে প্রথমতঃ বাদী এবং তাহার সাক্ষীর প্রমাণ আরম্ভ হইল। ত্রিলোচন দেখিলেন, তাহারা অনায়াসে মিথ্যা কথা কহিয়া সাব্যস্ত করিল যে, তিনি বাদীর নিকট হইতে ৭৫০৲ টাকা ধার লইয়াছেন। ঐ টাকা সুদে আসলে ৯০০৲ শত হইয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে ত্রিলোচন একবার তীর্থ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাহারা কহিল, ঐ তীর্থ দর্শন উপলক্ষে তাঁহার অর্থের প্রয়োজন হয়; এবং তজ্জন্য তিনি ঋণ করেন।

ত্রিলোচন সমস্ত শুনিয়া অবাক্ হইলেন। তিনি তীর্থে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য কাহারও নিকট ঋণগ্রহণ করেন নাই। বাদীর পক্ষ হইতে এক খত বাহির হইল; তাহাতে ত্রিলোচনের নাম লেখা। ত্রিলোচন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, ঐ লেখা তাঁহার হস্তাক্ষরের ন্যায়। অথচ তিনি নিজে কখনও এমন কাগজে স্বাক্ষর করেন নাই। সমস্ত ভাবিয়া ত্রিলোচনের পা হইতে মাথা অবধি জ্বলিয়া গেল। যখন তাঁহার নিজের প্রমাণ দিবার সময় আসিল, ত্রিলোচন তখন প্রায় জ্ঞান-হারা। মানুষ এমন মিথ্যা সাজাইতে পারে বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল না।

হলপ পড়াইবার পর যখন ত্রিলোচনের প্রতি প্রশ্ন আরম্ভ হইল, ত্রিলোচন তখন কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিলেন,—"হরিবলে আমার নাম ত্রিলোচন দাস, হরিবলে বাপের নাম রামকৃষ্ণ দাস ইত্যাদি।"

জবানবন্দীতেও তাহার জবাব হইতে লাগিল,—"হরিবলে আমি বাদীকে চিনিই না। হরিবলে কারও কাছে আমি টাকা ধার করি নাই হরিবলে—"

"বিচারক দুই কারণে ত্রিলোচনের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, এক তাঁর কম্প দেখিয়া আর তাঁর মুখে "হরিবলে" শুনিয়া। প্রথমতঃ দু' একবার কহিলেন,—"ভাল ভাবে বল। হরিবলেটা ছেড়ে দিয়ে বল। কাঁপ কেন?"

ত্রিলোচন কিন্তু ইহাতেও সংশোধিত হইবার নহেন। 'হরিবলে' তাহার কথার মাত্রা। এমনই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে 'হরিবলে' বাদ দিয়া কথা বলা তাঁহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। ত্রিলোচনের মুখ দিয়া 'হরিবলে' বাহির হইতেই লাগিল।

অল্প ক্ষণের মধ্যেই বিচারকের ধৈর্য্য চ্যুতি হইল। তিনি কহিলেন,—"ফের যদি 'হরিবলে' 'হরিবলে' করবে তা হলে তোমার ভাল হবে না। সোজা ভাবে বলিতে পার না?"

ত্রিলোচন উত্তর করিলেন,—"কি করব হুজুর, হরিবলে আমার মুখের কথার মাত্রা হরিবলে। আর যা বলেন সব পারি; কিন্তু জীবন কর্ত্তার নাম ভুলিতে পারি না।"

হাকিম এবার চটিলেন,—"কহিলেন আবার 'হরিবলে' বল্লেই মোকদ্দমা ডিক্রি দেব বলছি।"

ত্রিলোচনের এইবার কেমন অসহ্য হইল, তিনি কহিলেন—"হরিবলে তাই যদি হুজুরের বিবেচনায় হয়, তা হলে হরিবলে দেন ডিক্রী। হরিবলে এত মিথ্যাই যখন করেছে, হরিবলে তখন হুজুরও যে ডিক্রি দেবেন, তা-আর বিচিত্র কি হরিবলে?"

ত্রিলোচনের জবানবন্দীর পর তিনি আর সাক্ষী দিতে দিলেন না মোকদ্দমা তাহার প্রতিকূলে ডিক্রি হইল, ইহা বলাই বাহুল্য। মিথ্যা প্রমাণের সহিত হাকিমের ক্রোধও কিঞ্চিৎ যোগ দিয়াছিল সন্দেহ নাই।

অষ্টম অধ্যায়।

কেহ কেহ ত্রিলোচনকে আপীল করিতে পরামর্শ দিয়াছিল। তিনি তাহা করিলেন না। ত্রিলোচন সংসারে তেমন আসক্ত ছিলেন না। তাঁহার সংসার অন্যের জন্য। এই ঘটনায় তিনি সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণ হইলেন। ডিক্রির টাকা শোধ করিবার জন্য নগদ কিছুই তাঁহার হাতে ছিল না। ত্রিলোচন বুঝিলেন, ইহারই নিমিত্ত তাঁহার জমিটুকু যাইবে। সংসার হইতে বিচ্যুত হইবার এই এক অবসর উপস্থিত হইল ভাবিয়া, তিনি মনে মনে সেইরূপ সংকল্পই করিলেন। গ্রামের লোকেরা কিন্তু তাঁহার এই সংকল্পে অত্যন্ত দুঃখিত হইল।

কাহার কর্তৃক এ ঘটনা হইয়াছে, তাহা এখন আর গ্রামে কাহারও জানিতে বাকী নাই। ত্রিলোচনের সহিত যাহারা কাঁথিতে গিয়াছিল, তাহাদের একজন সেখানে গোপালকে দেখিতে পাইয়াছিল। গোপাল রামসুন্দরের দক্ষিণ হস্ত। রামসুন্দরের ষড়যন্ত্রেই যে এই মোকর্দ্দমা হইয়াছে, তাহা গ্রামের সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে। ত্রিলোচনের প্রতি তাহাদের ভালবাসাও অত্যন্ত অধিক। ত্রিলোচনকে বাঁচাইবার জন্য

তাহাদের সকলেরই চেষ্টা। তাহাদের অনেকে যাইয়া এ সম্বন্ধে মধু মণ্ডলকে অনুরোধ করিল। কিন্তু ত্রিলোচন নিজে উদাসীনের ন্যায় রহিলেন, কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

দু'মাস বাদেই ডিক্রি জারি হইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিলোচনের জমি বাড়ী ক্রোক হইল। ক্রমে তাহা নীলামে উঠিল। মধু মণ্ডলের পয়সা থাকিলে তিনি ইহা রক্ষা করিতেন। কিন্তু তাঁহার তেমন অর্থ নাই। গ্রামের অন্য লোক ত সকলেই প্রায় নিঃস্ব। তথাপি মধু মণ্ডলের পুত্র নীলাম ডাকিতে গিয়াছিল।

রামসুন্দর উচ্চ ডাক ডাকিয়া ত্রিলোচনের জোত জমি ক্রয় করিলেন।

নীলামে যে মূল্য হইল, তাহাতে ডিক্রির দেনা শোধ হইয়া ত্রিলোচনের কিছু পাওনা হইল। ত্রিলোচন এই টাকার অধিকাংশই ভক্তহরি এবং তাঁহার স্ত্রীকে দিলেন, এবং অল্প মাত্র নিজে লইয়া চিরদিনের জন্য দেশত্যাগের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অনেকে তাঁহাকে দেশে থাকিতে অনুরোধ করিল। ত্রিলোচন কিছুতেই থাকিলেন না। তিনি কহিলেন,—"আর যখন দুটি লোক এলে হরিবলে আমি তাদের আদর অভ্যর্থনা করিতে পারিব না, তখন হরিবলে আমার ঘরে থাকার আর দরকার কি? হরিবলে যাই এক দিকে চলে"।

ত্রিলোচন দাসের দেশ ত্যাগের দিন তাঁহার বাড়ীতে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য হইয়াছিল। গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা অনেকেই তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। অন্য গ্রাম হইতেও দু' চারি জন লোক আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। ত্রিলোচনের বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। কোন প্রিয়জনকে বিদায় দিতে বাড়ীর লোকের মধ্যে যেরূপ ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে, সমাগত স্ত্রী পুরুষদিগের মধ্যে ঠিক

তাহাই হইয়াছিল। ত্রিলোচনের সকলেই আত্মীয়, সকলেই যেন আপনার লোক। অবশ্য রামসুন্দর এ সকলের মধ্যে নহেন।

সংসারে পুরুষ অপেক্ষা রমণীর প্রাণ অধিক কোমল। হরিবলা চির দিনের জন্য দেশত্যাগী হইবেন শুনিয়া বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা অনেকে তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, সকলেরই চক্ষু দিয়া জল ঝরিতেছিল। জননীদিগকে কাঁদিতে দেখিয়া ক্রোড়স্থ শিশু সন্তানগণও কাঁদিতেছিল। প্রৌঢ়া এবং বৃদ্ধারা কেবল ত্রিলোচনের গুণ কীর্ত্তন করিতেছিলেন। কেহ বলিতেছেন,—'আমার ছেলে পিলেকে বড়ই ভাল বাসিতেন।' কেহ কহিতেছিলেন,—'আমাদের বাড়ীতে রোজ একবার যাওয়াছিল।' কেহ অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহিতেছিলেন,—'আপনার ব্যাটা বেটী নাই, পরের প্রতিই যত মায়া মমতা ছিল। গাছের আম কাঁটাল পাকিলে গ্রামের ছেলে জড় করে এনে খাওয়াতেন। যারা এমন লোককে দেশ ছাড়া কল্লে তারা কি ভাল থাকবে!'

দুর্ব্বলের এক বল রোদন, আর এক বল অভিসম্পাত।

ক্রমে ত্রিলোচনের গৃহ ত্যাগের সময় উপস্থিত হইল। তিনি উপস্থিত শিশুদিগকে চুম্বন দিয়া, বালক বালিকাগণকে আদর দেখাইয়া, যুবক বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা দিগের নিকট বিদায় চাহিলেন। এই সময়ে—অনেকেই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। শিশুরা মাতৃক্রোড়ে থাকিয়াই 'ওমা হরিবলা কোথায় যায়!' বলিয়া জননীর অঞ্চল আকর্ষণ করিতে লাগিল। ত্রিলোচন অনেককে সান্ত্বনা করিলেন।

বৃদ্ধেরা কেহ কেহ কাঁদিল এবং কহিতে লাগিল,—"আর কি আমরা এ গ্রামে থাকতে পারব?"

ত্রিলোচন বুঝাইলেন,—"ভগবান ভরসা, হরিবলে কেবল তাঁকেই ডেকো। পাপের বৃদ্ধি ক'দিন থাকে হরিবলে?"

ত্রিলোচন যাত্রা করিলেন। কেহ কেহ কাঁদিতে কাঁদিতে কিছু দূর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিল। গ্রামের পক্ষে ত্রিলোচনের এই মৃত্যু দিন।

ত্রিলোচন তুমি ভাগ্যবান পুরুষ সন্দেহ নাই। সংসারে তোমার মত লোকেরই জন্ম সার্থক।

সাধক কবি তুলসী দাস কহিয়াছেন,—"হে মানব, যখন তুমি সংসারে আসিলে, তখন সকলে হাসিল, কিন্তু তুমি কাঁদিলে; সংসারে এমন কাজ করিও যে, তুমি যখন যাও, তখন যেন সকলে কাঁদে, আর তুমি হাসিতে পার।"

রামসুন্দর, তোমার অদৃষ্টে ইহা ঘটিবে কি? তুমি যে হরিবলাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দেশ ছাড়া করিলে, সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। তুমি সংসার ছাড়িবার দিন হাসিতে পারিবে কি? তুমি জীবিত থাকিতেও অনেক দুর্ব্বল এবং দরিদ্র মনে মনে তোমার মৃত্যু কামনা করে না কি?

নবম অধ্যায়।

মেদিনীপুরের গল্প বলিতে বলিতে আমাদিগকে ময়মনসিংহে যাইতে হইল। ময়মনসিংহ এবং মেদিনীপুর বাঙ্গলার দুই প্রধান জেলা। ইহার একটি, বাঙ্গালা দেশের উত্তর পূর্ব্বাংশে, অপরটি দক্ষিণ পশ্চিমাংশে। ময়মনসিংহে অনেক জমিদারের বাস। পবিত্র ও পুণ্যতীর্থ ব্রহ্মপুত্র নদ এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

১২—সালের কার্ত্তিক মাসের ২৯শে তারিখে প্রভাত সময়ে যদি কেহ জামালপুরের নীচে ব্রহ্মপুত্র পার হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে, ভিন্ন দেশীয় দুইটি লোক ডুলিতে চড়িয়া খেয়া নৌকায় যাইতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ, অন্যটি যুবক।

ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া ডুলি দুইখানি সেরপুরাভিমুখে চলিল। সেরপুর জামালপুর হইতে পাঁচ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। বেলা নয়টার সময় ডুলি দুইখানি সেরী নদীতীরে উপস্থিত হইল। সেরী নদী পার হইলেই সেরপুর। সেরপুর ময়মনসিংহ জেলার একটি প্রধান স্থান। এই স্থানে পুলিষ থানা, দেওয়ানী আদালত, বিদ্যালয়, ঔষধালয় প্রভৃতি আছে। মিউনিসিপালিটী রহিয়াছে বলিয়া ইহার নাম সহর সেরপুর। বগুড়া

জেলার অন্তর্গত সেরপুর হইতে পৃথক করিবার জন্যও বোধ হয় এই নাম। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল 'দশ কাহনিয়া সেরপুর'। তখন বিস্তৃত ব্রহ্মপুত্র নদ ইহার নিম্নে প্রবাহিত হইত। পারের মাশুল দশ কাহন কড়ি ছিল বলিয়া স্থানটির এইরূপ নাম ছিল। অধুনা ব্রহ্মপুত্রের অধিকাংশ জলই যমুনা বা যবুনা নামে সিরাজগঞ্জের নিকট দিয়া আসিয়া গোয়ালন্দের অনতিদূরে পদ্মায় আসিয়া পড়িতেছে। প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের স্থানে ক্ষুদ্র এক খাড়ি রহিয়াছে বলিলেই হয়।

সেরপুর প্রাচীন স্থান তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষ সের খাঁ কর্ত্তৃক ইহা সংস্থাপিত। সেরপুরের নিম্নবাহিনী ক্ষুদ্র তটিনী তাঁহারই নামানুসারে সেরী নদী বলিয়া পরিচিত। সেরপুর যে পরগণার অন্তর্গত তাহার নামও সেরপুর। ফলতঃ সহর সেরপুরকে সেরপুর পরগণার রাজধানী বলা যাইতে পারে। সেরপুর পরগণা অতি বিস্তীর্ণ। সুন্দরবনে না যাইয়া এখানে আসিলে অনেকে আবাদের জমি পাইতে পারেন। ইহার অনেক ভূমি এখনও জঙ্গলাকীর্ণ বা অকৃষ্ট অবস্থায় রহিয়াছে। গারো পাহাড় ইহার সন্নিহিত। সেরপুর হইতে উত্তর দিকে কিঞ্চিদ্দূর গেলেই স্বাভাবিক দৃশ্য অতি সুন্দর।

সেরপুর পরগণার জমিদার বৈশ্যবংশীয় ভূম্যধিকারীদিগের বাস সহর সেরপুরে। ইঁহাদের মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্ত অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট্। বাড়ীতেই তিনি কাছারী করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোল্লিখিত ডুলি দুইখানি তাঁহারই ভবনদ্বারে উপস্থিত হইল।

ডুলি হইতে নামিয়া বৃদ্ধ এবং যুবক এক পুষ্করিণীতে অবগাহন করিল; এবং কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া কখন কাছারি বসিবে, তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বেলা দুইটার পর জমিদার প্রভু তাঁহার অবৈতনিক বিচারাসনে উপবেশন করিলেন। দু' একখানি দরখাস্ত লইবার

পরেই ডাক পড়িল "নিত্যানন্দ দাস বাদী হাজির?" কেহ উত্তর দিল না।

আসামীর ডাক পড়িতেই সেই ভূলিস্থিত বৃদ্ধ কহিল,—"হাজির।"

হাকিম গরম হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাদীর মোক্তার কে?"

মোক্তার রাধামোহন দাস উত্তর করিল,—"হুজুর, আমি।"

পুনরায় প্রশ্ন হইল,—"বাদী কোথায়?"

মোক্তার বলিল—"আজ্ঞে আমি জানি না। বিদেশী মক্কেল, দরখাস্ত লিখে দি'ছিলাম, আর খবর নাই। মেদিনীপুরে তার বাড়ী।

আসামী উত্তর করিল,—"আজ্ঞে আমারও বাড়ী মেদিনীপুর জেলায়। আমার চৌদ্দ পুরুষে কখনও এদেশে আসে নাই। আদালতের ওয়ারেণ্ট দেখিয়াই আমি অজ্ঞান। বাদী হাজির হইবে না, তা ত আমি জানিতাম। যে বাদী, তাও বুঝিতে পারিতেছি। যে দুর্ভোগ ভুগিয়াছি, তা আর শোধ হবার নয়। বাড়ী থেকে দু'পা বেরোতে পারি না।"

হাকিম দেখিলেন, লোকটার চেহারা অত্যন্ত রোগা। পুনরায় রাধামোহন মোক্তারকে কহিলেন,—"বাদী হাজির কর্ত্তে পারবে?"

"কেমন করে পারব হুজুর?" বলিয়া মোক্তার উত্তর করিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"তাহ'লে আসামী খালাস হ'ক।"

মোক্তার বলিল,—"তাহাতে আপত্তি নাই।"

এই সময়ে আসামী কহিল,—"হুজুর খালাস ত দিলেন, কিন্তু সে বাদীর কিছুই হ'ল না। যে ভাবের মোকদ্দমা, হুজুর শুনলে বুঝতে পারবেন। গ্রামের একটি লোক, রামসুন্দর সামন্ত, তাঁহার সহিত আমার বিবাদ। বিবাদ এই যে, তিনি লোকের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করেন, আমি তাহা সহ্য করিতে পারি না। সেই জন্য পরোক্ষে দুই

এক কথা বলিয়াছিলাম। গোপাল নামে তাঁর একটি সর্ব্বকর্ম্মা চাকর আছে। সে ব্যাটা লোকের সর্ব্বনাশ করিতে বিলক্ষণ মজবুত। আমাকে জব্দ করবার জন্যে সেই এসে হুজুর আদালতে দরখাস্ত দিয়েছে। ঈশ্বরেচ্ছায় আমার যা আছে, তাতে গোপালের মতন লোক দুচারি জন আমিই চাকর রাখ্‌তে পারি।"

হাকিম এই কথা শুনিয়া রাধামোহনের নিকট বাদীর চেহারা কিরূপ ছিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাধামোহন যেরূপ বলিল, তাহাতে মধুমণ্ডল পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন, যে সে গোপাল ভিন্ন অন্য কেহই নহে।

এখন আর পাঠককে বলিতে বাধা নাই যে, হাজিরা আসামী বৃদ্ধ মধুমণ্ডল আর দ্বিতীয় ডুলিতে তাঁহারই পুত্র ব্রজগোপাল। গোপাল সেরপুরে আসিয়া যে নালিশ করিয়াছিল তাহার মর্ম্ম এই যে, মধু মণ্ডল নামে একজন চাকর সঙ্গে লইয়া সে বা নিত্যানন্দ শীতল পাটীর কারবার করিতে সেরপুরে আসিয়াছিল। মধুর কাছেই তাহার টাকাকড়ি যা কিছু ছিল। মধু তাহা লইয়া চম্পট দিয়াছে। এমন ঘটনা কল্পিত হইলেও সহজেই তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয়। হাকিম মধুর নামে ওয়ারেণ্ট দিয়াছিলেন। তাই মধুকে মেদিনীপুর হইতে ময়মনসিংহের সেরপুরে আসিতে হইয়াছে। এখন মোকর্দ্দমার ফরিয়াদি ফেরার।

হাকিম বলিলেন,—"আসামীকে খালাস দিলাম। বাদীর অনুসন্ধান করিয়া ফল নাই। মিথ্যা মোকর্দ্দমা করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে মোকর্দ্দমা চলিতে পারে বটে, কিন্তু প্রমাণ বড়ই দুর্ব্বল হইবে। অপরিচিত লোক এখানে একদিন দু'দিন মাত্র রহিয়াছে। যে মোক্তার দরখাস্ত দিয়েছেন, তিনিই হয় ত বলিবেন, আমি তাকে ভাল ক'রে চিন্‌তে পার্‌বো না।"

রাধা মোহন অমনই আম্‌তা আম্‌তা আরম্ভ করিলেন —"আজ্ঞে তা'ত বটেই, একদিন মাত্র দেখা, তা'তে কি চেহারা ঠিক ক'রে রাখা যায় ?"

মধু মণ্ডল দেখিলেন, গোপালের নামে নালিশ করিয়া ফললাভ করা কঠিন। সে বিষয়ে তিনি পীড়াপীড়ি করিলেন না। মনে মনে একবার সেই ব্রহ্মাণ্ডের বিচারপতির নিকট গোপালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া পুত্রকে কহিলেন,—"চল, ঘর যাই।" পুনরায় ডুলিতে উঠিয়া তাঁহারা জগন্নাথগঞ্জে আসিলেন।

দশম অধ্যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রজগোপালের পিতৃভক্তি ছিল। মাতৃহারা সন্তান পিতার প্রতি অনুরক্ত না হওয়াই অস্বাভাবিক। ব্রজগোপাল বাড়ী হইতে সেরপুর পর্য্যন্ত ছায়ার ন্যায় পিতার অনুসরণ করিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় বৃদ্ধ পীড়িত হইলেন।

জগন্নাথগঞ্জে আসিয়াই তাঁহার জ্বর হইল। পাঠক জানেন, মধুর শরীর রুগ্নই ছিল। মেদিনীপুর হইতে ময়মনসিংহ যাতায়াতের ক্লেশ সে শরীরে সহিবে কেন? পিতার অসুখ দেখিয়া ব্রজগোপাল বড়ই চিন্তিত হইলেন। কোন মতে তাঁহাকে জাহাজে ও গাড়ীতে কলিকাতা পর্য্যন্ত আনিলেন। সেখানে আসিয়াই মধুর পীড়া বৃদ্ধি পাইল, তাঁহার চলৎশক্তি রহিত হইল। মধুকে বাড়ী লইয়া যাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল।

মধুর ইচ্ছানুসারে ব্রজগোপাল তাঁহাকে কালীঘাটে লইয়া গেলেন। মধু কহিলেন,—'বাবা আমাকে গঙ্গাতীরে রাখ।' পুত্র তাহাই করিলেন; পিতাকে লইয়া গঙ্গাতীরের একটি বাড়ীতে রাখিলেন। মধুর জ্বর ক্রমশই প্রবল হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে কাসি দেখা দিল। ব্রজ-

গোপাল পিতার চিকিৎসা শুশ্রূষার নিমিত্ত বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তাহাদের সঙ্গে একটি মাত্র ভৃত্য ছিল। ব্রজগোপালের হাতে টাকা অধিক ছিল না। তিনি কলিকাতার কোন সহাধ্যায়ীর নিকট হইতে কিছু টাকা ধার করিয়া আনিলেন।

মধুর রীতিমত চিকিৎসা হইতে লাগিল। পীড়ার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া উঠিল। মধু পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বাঁচিবার আশা নাই। ব্রজগোপালের মনে প্রথমতঃ এমন ভাবনা আসে নাই। পিতার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার ভয় হইতে লাগিল। চিকিৎসক কহিলেন,—'রুগ্ন অবস্থায় অনেক পথশ্রম সহ্য করাতেই ইঁহার পীড়া সাংঘাতিক হইয়া দাড়াইয়াছে।' ব্রজগোপাল 'শশুরুংন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। চিকিৎসক তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, এখনও ইনি আরোগ্য লাভ করিতে পারেন। আপনি অমন নিরাশ্বাস হইলে চলিবে না। কে ইঁহার শুশ্রূষা করিবে?

ব্রজগোপাল কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"মহাশয় আমি নিরাশ্বাস হইব না? সংসারে পিতা ভিন্ন আমার আপনার বলিতে কেহই নাই। পিতাই আমার মাতা পিতা উভয়ের কাজ করিয়াছেন। জীবনে আমাকে উঁচু কথাটি কহেন নাই। এখনও আমার মাথার চুলটি বেগোছাল দেখ্‌লে বাবা কাছে ডেকে নিয়ে নিজের হাতে তাহা সমান করিয়া দেন। মুখে একটু ঘাম দেখিলে নিজের কাপড় দিয়া তাহা মুছাইয়া দেন। বাবা নিজে কখনও ভাল কাপড় পরেন নাই, কিন্তু আমাকে খারাপ কাপড় পরতে দেখলে তা' বাবার সহ্য হয় না। সেই বাপকে আমি এই ভাবে বিদেশে হারাতে বসেছি; আমি কাঁদিব না ত কাঁদিবে কে?"

ব্রজগোপালের ক্রন্দন শুনিয়া চিকিৎসকের চক্ষে জল আসিল।

তিনি অতি কষ্টে তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে ব্রজগোপাল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবান, যারা এই রকম চক্রান্ত ক'রে আমার বাবাকে সেরপুরে নিয়ে তাঁর মৃত্যুর কারণ হ'ল, তুমি তাদের বিচার ক'রো।"

চিকিৎসক সেরপুরে যাওয়ার কথাই শুনিয়াছিলেন। চক্রান্তের কথা শুনিয়া মর্ম্ম বুঝিতে না পারায় ব্রজগোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কারা ওঁকে সেরপুরে নিয়ে যায়?" ব্রজগোপাল সংক্ষেপে উত্তর দিলেন। শুনিয়া চিকিৎসক শিহরিয়া উঠিলেন।

রামসুন্দর, গোপালচন্দ্র, তোমাদের কার্য্যের কথা শুনিলে মনুষ্য মাত্রই শিহরিয়া উঠিবে। পিতৃভক্ত পুত্রের মর্ম্মভেদী অভিসম্পাত কি তোমাদের হাড়ে হাড়ে বিঁধিবে না?

ব্রজগোপাল এবং চিকিৎসক মধু হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ছিলেন। তথাপি পুত্রের শেষ আর্ত্তনাদ পিতার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল।

মধু ব্রজগোপালকে ডাকাইলেন, এবং তাঁহাকে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। মধু তখনও কথা কহিতে পারেন। জ্ঞান তাঁহার সম্পূর্ণ ছিল। তিনি কহিলেন,—"বাবা কেঁদ না, বাপ কাহারও চিরদিন থাকে না। মা গঙ্গা যদি আমাকে টানেন, আর তোমার সমক্ষে আমি দেহত্যাগ কর্‌তে পারি, তা হলেই আমার মঙ্গল। অন্তিম সময়ে আমার মুখে একটু গঙ্গাজল, আর কানে হরিনাম দিও। তুমি যে ভাবে আমায় গঙ্গায় ফেলে যাবে, তাতেই আমার সদ্গতি হবে।"

ব্রজগোপাল কাঁদিয়া উঠিলেন। মধু তাহাকে থামিতে বলিয়া কহিলেন,—"বাবা, এই বেলা আমাকে তীরস্থ কর।"

পাঠকের স্মরণ আছে, একদিন বরদাকান্ত ভট্টাচার্য্য আর রামসুন্দর আলোচনা করিয়াছিলেন যে, ব্রজগোপাল হিন্দু ধর্ম্মে আস্থাবান্ নহেন।

ব্রজগোপালের অন্তঃকরণে মধুর ন্যায় বিশ্বাস না থাকিলেও তিনি এমন ভাবে পিতার আদেশ প্রতিপালন এবং তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিতে লাগিলেন, যে, সংসারে অল্পসংখ্যক সন্তানই তেমন ভাবে পিতার অন্তিম সময়ে তাঁহার সেবা করিতে পারেন! ব্রজগোপাল পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া মনে করিতেন। জ্ঞানতঃ তিনি কখনও পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই। ইহাও ঠিক যে ব্রজগোপাল অধার্ম্মিক ছিলেন না। কতকগুলি অনুষ্ঠানে তাহার আস্থা ছিল না, আর ছিল না সংকীর্ণতা। এই সূত্র ধরিয়াই রামসুন্দর তাঁহার নিন্দা করিতেন। মধু কখনও পুত্রকে এ সম্বন্ধে কথাটি কহেন নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার অভিলষিত কার্য্য গুলি ভক্ত পুত্র অতিশয় নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিলেন। মধু কহিলেন,—"বাবা গঙ্গায় যাবার পূর্ব্বে আমার একবার মাকে দর্শন করতে ইচ্ছা হয়।" ব্রজগোপাল একখানি পাল্কী আনাইয়া পিতাকে কালীর মন্দিরে লইয়া গেলেন। উত্থানশক্তিরহিত বৃদ্ধ কপালে হস্ত তুলিয়া দেবতাকে প্রণাম করিলেন। গঙ্গাতীরে আসিয়া মধু কহিলেন,—"বাবা আর আমি জল খেতে চাইলে আমাকে গরম গরম জল দিও না। কেবল গঙ্গাজল দিও।" ব্রজগোপাল পিতার মুখে গঙ্গাজলই দিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মধুকে তীরস্থ করা হইল। ব্রজগোপাল ও তাঁহার স্বজাতীয় ভৃত্য ব্যতীত আর কেহই নিকটে ছিল না। মধ্যে মধ্যে ভৃত্যকে এখানে ওখানে পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে, ব্রজগোপালকে একাকীই পিতার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

অৰ্দ্ধ রাত্রি অতীত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মধুর কথা জড়াইয়া আসিল। কহিলেন,—"বাবা, হরিবল"।

ব্রজগোপাল—"বাবা কোথায় যাও" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া

উঠিলেন। তাঁহার ভৃত্য তাঁহাকে থামিতে বলিলেও ব্রজগোপাল থামিতে পারিলেন না। পিতার চরণ স্পর্শ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন,—"বাবা, কত অপরাধ করেছি, ক্ষমা করো। না জেনে হয়ত তোমার মনে কত ব্যথা দিয়েছি, সে সব ভুলে যাও, বাবা। শৈশবে হয় ত তোমাকে কত মেরেছি, বাবা, তুমি আমার মা—বাবা দু'য়েরই কাজ করেছ বাবা—তোমার স্নেহের, তোমার বাৎসল্যের প্রতিদানে কিছুই কর্ত্তে পারলেম না, বাবা—আমি তোমার অধম সন্তান, বাবা।"

ব্রজগোপালের ক্রন্দন শুনিয়া তটলগ্ন নৌকার কয়েকজন নাবিক নাবিয়া আসিয়াছিল; এবং সেই শোকাবহ দৃশ্য দেখিয়া অজস্র অশ্রুপাত করিয়াছিল।

ভৃত্য ব্রজগোপালকে বুঝাইল, কর্ত্তার সময় হয়েছে; এখন উঁহার কানে হরিনাম দিন্। ব্রজগোপালের পিতৃ-আদেশ মনে পড়িল। চক্ষের জল মুছিয়াই তিনি আরম্ভ করিলেন—"হরিবোল, হরিবোল" গঙ্গা জল লইয়া এক একটু বৃদ্ধের মুখে দিতে লাগিলেন, আর মুখে কেবল এক কথা হরিবোল, হরিবোল। ইহার কিছু কাল পরেই মধুর প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

ব্রজগোপাল অশ্রুপ্লাবিত মুখে সেই রাত্রিতেই মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন।

পর দিন প্রাতঃকালেই তিনি বাড়ী যাইবার জন্য গোওথালির ষ্টিমারে উঠিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

ত্রিলোচন দাসের দেশত্যাগে এবং মধুমণ্ডলের মৃত্যুতে রামসুন্দর বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, কেননা তাঁহার কথার বা কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার লোক আর গ্রামে রহিল না। রামসুন্দর তখন একচ্ছত্রী। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে লাগিলেন। গ্রামের লোক তাঁহার প্রতি পূর্ব্ব হইতেই বীত-রাগ ছিল। মধুর মৃত্যুতে অনেকে ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। প্রকাশ্যে কেহ কিছু না বলিতে পারিলেও মনে মনে সকলেই রামসুন্দর এবং গোপালকে পরম শত্রু মনে করিতে লাগিল। ইচ্ছা করিয়া আর কেহ রামসুন্দরের বাড়ীতে যাইত না। বরদাকান্ত কিছু কিছু প্রাপ্তির খাতিরে কেবলমাত্র মধ্যে মধ্যে সেখানে যাইতেন, কেন না রামসুন্দরের বাড়ীতে দেবার্চ্চনাদির রীতিমত ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু মধুর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহারে বরদা কান্তের অন্তঃকরণেও দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল।

রামসুন্দর গ্রামের লোকের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কিছু দিনের

জন্য দূরে থাকা কর্ত্তব্য মনে করিলেন। ভেলামারি নামে তাঁহার এক তালুক ছিল এবং গঙ্গার তীরেই ঐ তালুকের কাছারী। রামসুন্দর সেখানে চলিয়া গেলেন।

গ্রামে এমন লোকই ছিল না যে, ব্রজগোপালের সহিত প্রাণের সহানুভূতি না দেখাইল। মধুকে সকলেই ভালবাসিত এবং শ্রদ্ধা করিত। রামসুন্দরের আচরণে সেই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মধুর শ্রাদ্ধে সকলেই যথাসাধ্য সাহায্য করিল। পিতৃবিয়োগের পর ব্রজগোপাল অধিকদিন দেশে রহিলেন না। তাঁহার পিতার পরিচিত কোন একজন বড় লোকের অনুরোধে সত্বরই সব-রেজেষ্টারি চাকরী পাইয়া তিনি ডেব্‌রায় চলিয়া গেলেন। যাইবার দিন গ্রামের অনেক লোক একত্র হইয়া তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিল।

আর রামসুন্দরকে? তাঁহাকে বিদায় দিতে কেহ আসে নাই, বরং মনে মনে অনেকেই প্রার্থনা করিতেছিল, যেন তাঁহাকে আর গ্রামে ফিরিয়া আসিতে না হয়। ফলত: জন সাধারণের সহানুভূতি সর্ব্বদাই অত্যাচার-গ্রস্তের প্রতি ধাবিত হয়। অত্যাচারী প্রবল হইলে মানুষ প্রকাশ্যে অনেক স্থলে তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে পারে না বটে, কিন্তু মনে মনে যে অভিসম্পাত করিয়া থাকে, ইহা নিশ্চয়।

রামসুন্দর তালুকে যাইয়া প্রজাদিগের রক্ত শোষণ করিতে লাগিলেন; বাজে আদায়ে তহবিল পূর্ণ হইয়া উঠিল। রামসুন্দর কাছারিতে পৌছিলেই অনেক প্রজা আসিয়া তাহাকে নজর দিয়াছিল। তার পর রামসুন্দর তাহাদের ফৌজদারী ও দেওয়ানী হাকিমের কাজ করিতে বসিলেন। বিচারে প্রভেদ এই যে, ইঁহার দেওয়ানী ও ফৌজদারী সব

মোকর্দ্দমাতেই শাস্তি। আর শাস্তি কেবল জরিমানা। কেহ তাহার ভ্রাতার সহিত বচসা করিয়াছে, দশ টাকা জরিমানা। কাহারও বিধবা ভগ্নী বাহির হইয়া গিয়াছে, পঁচিশ টাকা। অমুকের ভ্রাতৃবধূ ভ্রূণ হত্যা করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়, পঞ্চাশ টাকা। এইরূপে নিরীহ কৃষক-কুলের শ্রম সঞ্চিত অর্থ রামসুন্দরের সিন্দুকে উঠিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে রামসুন্দরের পাপের সিন্দুকও বোঝাই হইতেছিল। কিন্তু সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অনেকের বিশ্বাস দস্যু তস্কর প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কেহ মানুষের প্রতি বিনা কারণে অত্যাচার করিতে পারে না। রামসুন্দরের ন্যায় লোকের চরিত্র যাঁহারা দেখেন নাই, তাহাদের একথা বলা অসঙ্গত নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভেলামারী কাছারি গঙ্গার নিকটবর্ত্তী, এখান হইতে গঙ্গা অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে হইবে। ভেলামারী ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে। এই গ্রামে অধিক লোকের বসতি নাই। এখান হইতে গঙ্গাসাগর অধিক দূর নহে। ভাগীরথীর বিস্তৃতি এই স্থানে দশ ক্রোশেরও উপর। বর্ষাকালে নদী সমুদ্রের অংশের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভেলামারীর কাছারীর নিকটে একটি খাল আছে, ঐ খাল পূর্ব্ব মুখে আসিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে।

একদিন সন্ধ্যাকালে রামসুন্দর দু' একজন লোক সঙ্গে লইয়া গঙ্গার ধার দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সেই খালের মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখেন, সেখানে একখানি বড় নৌকা বাঁধা আছে। নৌকায় অনেকগুলি লোক। তিনি একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথাকার নৌকা?"

নৌকার লোক উত্তর করিল,—"আমরা হাতীশুঁড়োর দ্বীপ হইতে আসিয়াছি। সেখানে রক্ষাকালীর পূজা করিব বলিয়া জিনিষ পত্র কিনিতে হাটে আসিয়াছিলাম। ফিরিয়া যাইবার সময়ে নদীতে বড় তুফান দেখিয়া যাইতে পারি নাই, আজ এখানে নৌকা বান্ধিয়া আছি। কাল সকালে যাইব।"

রামসুন্দর। তোমরা যে এখানে নৌকা বান্ধিয়াছ, তাহার জন্য খাজনা দিয়াছ ?

নৌকার লোক। আজ্ঞে না। জোয়ার ভাঁটার খালে আবার খাজনা কি ? আমরা পূর্ব্বেও এখানে অনেকবার নৌকা রাখিয়াছি।

রামসুন্দর। খাজনা দিতে হইবে।

নৌকার লোক। আমাদের কর্ত্তাপক্ষীয় ব্যক্তিরা সব উপরে গিয়াছেন। পূজার জন্য একজন পুরোহিত নিয়াছিলাম। আজ যাওয়া হল না বলে পুরোহিত ঠাকুর বাড়ীতে খেতে গেলেন, সেই সঙ্গে আমাদের ত' একজনও গেছেন ; তাঁরা না ফিরে এলে আমরা কিছুই বলতে পারিব না।

রামসুন্দর চটিলেন ; কহিলেন,—"তারা যদি নাই ফেরে ? আমার জমিতে নৌকা বেঁধেছ তার খাজনা পাঁচ টাকা ফেল।"

লোক। আমাদের কাছে টাকাই নাই। এমন ত অরাজক খাজনার কথা শুনি নাই।

রামসুন্দরের তখনই টাকা আদায় করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল ; কিন্তু দেখিলেন তাঁহার সঙ্গে লোক অধিক নাই। নৌকায় অনেক লোক, আর নৌকা ছাড়িয়া দিলে তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না। রামসুন্দর চটিয়া গেলেন, এবং কহিলেন,—"আচ্ছা তারা এলেই দেবে।"

অনন্তর তিনি খালের ধার দিয়া কাছারিতে ফিরিলেন।

সন্ধ্যার পরে হাতীশুঁড়োর নৌকার লোক যাহারা উপরে গিয়াছিল,

তাহারা ফিরিয়া আসিল। নৌকায় যাহারা ছিল, তাহারা রামসুন্দরের সহিত কথোপকথনের বা কলহের মর্ম্ম তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিল। পুরোহিত ঠাকুর পরামর্শ দিলেন, এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। রামসুন্দর না করিতে পারেন এমন কাজই নাই। খাজনা না পাইয়াই তিনি চটিয়াছেন। জোয়ার ভাঁটার খাল, এর আবার খাজনা। কিন্তু তিনি যখন চাহিয়াছেন, তখন আদায় না ক'রে ছাড়বেন, বোধ হয় না।

হাতীশুঁড়োর লোকেরা কহিল,—"এ রাত্রে গঙ্গায় যাওয়া অসম্ভব। আমরা চোরও নই, ডাকাতও নই। কি করিবে আমাদের ?"

রাত্রি প্রহরেক অতীত হইলে, নৌকার লোক অনেকেই নিদ্রিত হইল। ইহার কিছুকাল পরেই নৌকার মধ্যে একটি কোলাহল উঠিল। রামসুন্দরের লোকেরা নৌকার উপরে আসিয়া খাজনা চাহে। নৌকার লোকেরা একটু জোর করিয়া অস্বীকার করায়, উভয় পক্ষে কলহ হয়। রামসুন্দরের লোকেরা তাহাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতও বাদ পড়েন নাই। অল্পক্ষণের মধ্যেই নৌকার সমস্ত লোক ধৃত হইয়া রামসুন্দরের কাছারিতে চলিল।

নৌকার দ্রব্য যত কিছু সমস্তই অপহৃত হইল। তন্মধ্যে অধিকাংশই পূজার জিনিষ। চিনি, বাতাসা, ঘৃত, পাঁঠা, নূতন বস্ত্র ইত্যাদি।

রামসুন্দর, তুমিও না বাড়ীতে পূজা করিয়া থাক ?

লোকগুলি কাছারিতে পৌছিলে রামসুন্দর তাহাদিগের অপরাধ শুনিয়া তাহাদিগকে বাঁধিতে হুকুম দিলেন। প্রহার যথেষ্ট হইয়াছিল বলিয়া সে বিষয়ে আর হুকুমের প্রয়োজন ছিল না। রামসুন্দরের অনুচরেরা নৌকার লোকগুলিকে নির্ম্মমভাবে পশুর ন্যায় বন্ধন করিল।

অর্জুন দাস নামে এক জন প্রজার বাড়ী গঙ্গার অতি নিকটে।

হাতীশুঁড়োর লোকগুলির নৌকা যেখানে ছিল, সেখান হইতে কয়েক রসি মাত্র ব্যবধান। রামসুন্দর অর্জ্জুনকে ডাকাইলেন এবং তাহাকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া তাহার সহিত কি পরামর্শ করিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ চলিল। শেষে অর্জ্জুন ঘরের বাহিরে আসিল, এবং একজন লোক সঙ্গে করিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

হাতীশুঁড়োর নৌকার লোকগুলি সেই বাঁধা অবস্থাতেই রহিল। সকলেই মনে করিতে লাগিল, পুরোহিত ঠাকুরের পরামর্শ শুনিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলেই ঠিক হইত। গঙ্গায় যাইয়া তুফানে ডুবিয়া মরিতাম সেও ইহা অপেক্ষা ভাল ছিল।

মানুষের নিষ্ঠুরতার কাছে, অগ্নি, জল প্রভৃতির নিষ্ঠুরতা কিছুই নহে। অগ্নি জল প্রভৃতির নিষ্ঠুরতা আছে কিনা তাহাতেই সন্দেহ। তাহারা ডাকিয়া তোমাকে বিপদগ্রস্ত বা নির্য্যাতন করে না। কিন্তু মানুষের দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকে ইচ্ছা করিয়া আগুনে জলে ঝাঁপ দিয়া থাকে।

রামসুন্দর নৌকার লোকগুলিকে পশুর ন্যায় রাখিয়াছিলেন বলিলেও ঠিক হয় না। পশুকেও মানুষ নিরূপিত সময়ে আহার দিয়া থাকে, ইহারা তাহাও পায় নাই। পর দিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একজন পুলিস সবইনস্পেক্টর কয়েকজন কনষ্টেবল সহ ভেলামারীর কাছারিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের পশ্চাতে অর্জ্জুন দাস। পুলিস আসিয়াই লোকগুলিকে দেখিয়া কহিল,—"শালারা, নৌকা ক'রে এসেছ ডাকাতি কর্ত্তে।"

বলিয়া দিতে হইবে না যে অর্জ্জুন দাস তাহাদের নামে ডাকাতির অভিযোগ আনিয়াছিল। লোকগুলি এই কথা শুনিয়াই অবাক। পাঠকও হয়ত অবাক হইয়া থাকিবেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

দারগা বাবু তদন্ত আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুন দাসের বাড়ী দেখা হইল। রামসুন্দর, অর্জ্জুন থানায় যাইবার পরেই তাহার বাড়ীর কতকগুলি জিনিষ আনিয়া কাছারিতে ডাকাইতদিগের নিকটে রাখিয়া দিয়াছিলেন। সে সমস্ত পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। দারগা একবার ডাকাইতদিগের নৌকা দেখিতে চাহিলেন। সেখানে যাইয়া অস্ত্র শস্ত্র কিছুই পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল ভাঙ্গা চিনির হাঁড়ি, বাতাসার গুঁড়া, ছাগলের নাদি ইত্যাদি। কয়েকজন ডাকাইত দারগা বাবুর সঙ্গেই ছিল, তাহাদের একজন দেখাইয়া দিল,—"দেখুন এখনও আমাদের পূজার জিনিষের চিহ্ন রহিয়াছে। আমাদের ওখানে ওলাউঠা দেখা দিয়াছে; তাই মা রক্ষাকালীর পূজার নিমিত্ত আমরা ষাঁড়মারার হাটে আসিয়াছিলাম জিনিষ পত্র কিনিতে। বাতাসের জন্য কাল ফিরিয়া যাইতে পারি নাই।"

ইহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই বর্ণিত হইল। আসামীর উক্তি শুনিয়া, নৌকার অবস্থা দেখিয়া, এবং বাদীর কথিত ঘটনা বিবেচনা করিয়া দারগা বাবুর সহজেই প্রতীতি জন্মিল যে মোকদ্দমা মিথ্যা।

রামসুন্দর অবৈধ উপায়ে দারগাকে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহা ব্যর্থ হইল। দারগা সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। পর দিনই মহকুমায় রিপোর্ট গেল,—"মোকর্দ্দমা মিথ্যা বলিয়া আমার বিশ্বাস। আসামীরা যে জবাব দিয়াছে, তাহাই সত্য বোধ হয়।"

মোকর্দ্দমার প্রথম এজেহার এবং এই রিপোর্ট একই সময়ে মহকুমায় পঁহুছিল। বড় দারগা তদন্তে আসিলেন। এক দিন মাত্র থাকিয়া তিনিও দারগার সহিত একমত হইলেন। মহকুমার হাকিম অর্জ্জুন দাসের নামে মিথ্যা এজেহার দিবার জন্য মোকর্দ্দমা চালাইবার হুকুম দিলেন।

বলা কর্ত্তব্য যে, রামসুন্দর অর্জ্জুনকে বাঁচাইবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক শ্রেণীর লোক থাকে যাহারা মনিবের জন্য মিথ্যা এজেহার দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, ইত্যাদি সব করিতে প্রস্তুত। ইহারা বিপদে পড়িলে মনিব সাহায্য করিয়া থাকেন। রামসুন্দরের ন্যায় লোকও তাহাতে বিরত ছিলেন না। অর্জ্জুন ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইলে, রামসুন্দর তাহার জন্য কলিকাতা হইতে ব্যারিষ্টার আনাইলেন। বাড়ীতে স্বস্ত্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনের কল্যাণার্থ নারায়ণকে তুলসী দেওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, অর্জ্জুনের নিষ্কৃতি লাভ ঘটিল না। অর্জ্জুন যথাক্রমে মাজেষ্টারী হইতে দায়রায় সোপর্দ্দ হইল এবং দায়রার বিচারে তাহার পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ড হইল। রামসুন্দর সেই দিন হইতে অর্জ্জুনের স্ত্রী পুত্রের নিমিত্ত মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

রামসুন্দরের এতদিন বিশ্বাস ছিল যে, যত কেন পাপ করি না, ভগবানকে ডাকিলেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে। এবারে তাহার সেই

বিশ্বাস শিথিল হইল। এমন লোকের যে ভগবানকে ডাকিবার অধিকারই নাই, তাহা তাহার ধারণা ছিল না।

আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপ করিব, আর শেষে তাঁহাকে ডাকিব, এমন ডাকে কোন ফল হয় না। এত দিন রামসুন্দরের একথা বুঝিবার অবসরই হয় নাই। জীবনে তিনি কত লোককে কত প্রকারে যন্ত্রণা দিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সমুচিত ফল ভোগ করেন নাই। তিনি ভাবিতেন, আমি যে পূজার্চ্চনা করি, তাহাতেই সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া যায়। ভগবানের বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড-শাসন-রহস্য কে বুঝিবে? অনেক সময়ে মানুষ পাপ করিবামাত্রই তাহার দণ্ড ভোগ করে না বলিয়াই, বোধ হয়, রামসুন্দরের ন্যায় লোক প্রশ্রয় পায়, এবং নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছে বলিয়া বুঝিতে পারে না, অথবা বুঝিয়াও বুঝে না।

রামসুন্দর অর্জ্জুনের জন্য সেসন আদালতের দণ্ডের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করিলেন, তাহাতেও কোন ফল হইল না। রামসুন্দর অর্জ্জুনকে বাঁচাইবার জন্য যে এত চেষ্টা করিলেন সে কেবলই যে অর্জ্জুনের উপকারার্থ তাহা নহে। রামসুন্দরের ভয় ছিল যে অর্জ্জুনের মোকর্দ্দমা মিথ্যা স্থির হইলে তাঁহার নিজের উপরও কিছু বিপদ আসিতে পারে। সত্যসত্যই সেই বিপদ আসিল। অর্জ্জুন যে রামসুন্দরের পরামর্শ মত মিথ্যা এজেহার দিয়াছিল তাহাতে তাহাকে ধরা গেল না; কিন্তু কতকগুলি লোককে অন্যায়রূপে অবরোধ ও প্রহার করা বলিয়া পুলিস তাঁহার নামে রিপোর্ট দিল। হাকিম তাঁহাকে তলব দিলেন। রামসুন্দর ইতি পূর্ব্বে কখনও ফৌজদারী মোকর্দ্দমার আসামী হন নাই। এবার হাকিম, পুলিস তাঁহার বিরুদ্ধ বলিয়াই এমন হইল। রামসুন্দরের বুকের রক্ত খানিকটা শুকাইয়া গেল। তাঁহার আশ্বাসের বিষয় দুইটি ছিল। একটি এই যে, যে দুই অপরাধের জন্য তাঁহার নামে অভিযোগ,

সে দুই অপরাধই আপোষের যোগ্য। আর ভেলামারী যে মহকুমার অধীন, তাহার বাড়ী সে মহকুমার অধীন নহে।

রামসুন্দর মোকর্দ্দমাটি মিটাইবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন। যে সমস্ত লোককে তিনি কয়েদ রাখিয়াছিলেন এবং প্রহার করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই দরিদ্র। দেশে জমি জমা কিছু নাই বলিয়াই তাহারা দ্বীপে যাইয়া রহিয়াছে। কিছু কিছু অর্থ দিয়া রামসুন্দর তাহাদের সকলকেই বাধ্য করিলেন। তাহারা মোকর্দ্দমা ছাড়িয়া দিল। হাকিম রামসুন্দরকে খালাস দিবার সময়ে কহিয়া দিলেন, সাবধান থাকিও। আর লোকের উপর এমন ভাবে অত্যাচার করিও না। রামসুন্দর নমস্কার করিয়া বিদায় হইলেন। মনে মনে কহিলেন, আর তুমি আমাকে ভেলামারীতে দেখিতে পাইবে না।

রামসুন্দর কিছু মনমরা হইয়া ভেলামারী হইতে বাড়ী আসিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ধনঞ্জয় দাস নামে এক দরিদ্র কৈবর্ত্ত রামসুন্দরের বাড়ীর নিকটে বাস করিত। ধনঞ্জয় নিরীহ কৃষক। ধনঞ্জয়ের স্ত্রী ও দুইটি পুত্র ভিন্ন আর কেহ ছিল না। সামান্য যে জমি ছিল, ধনঞ্জয় বড়ই পরিশ্রম করিয়া তাহা আবাদ করিত। অন্যে সেই পরিমাণ জমিতে যে শস্য উৎপন্ন করিতে পারিত, ধনঞ্জয় তদপেক্ষা অনেক অধিক পাইত।

যখন জমিতে হলকর্ষণ, শস্য বপন, তৃণোৎপাটন প্রভৃতি কাজ থাকিত না, ধনঞ্জয় তখন অন্যের কাজ করিত এবং তাহাতে তাহার পারিশ্রমিক মিলিত। ধনঞ্জয় কখনই অলসভাবে বসিয়া থাকিত না। গ্রামের সকল লোকেই তাহাকে ভালবাসিত এবং আদর্শ কৃষক বলিয়া আদর করিত। অবসর সময়ে ধনঞ্জয় রামসুন্দরের অনেক উপকার করিত বলিয়া রামসুন্দরেরও তাহার প্রতি সুদৃষ্টি ছিল।

ধনঞ্জয়ের ক্ষুদ্র সংসার শান্তি পূর্ণ ছিল। তাহার স্ত্রী অতিশয় পতিপরায়ণা। ধনঞ্জয় মাঠে যতই খাটিয়া আসুক না কেন, গৃহে আসিবামাত্র স্ত্রীর ব্যবহারে সে সমস্ত শ্রান্তি ক্লান্তি ভুলিয়া যাইত। সন্তান দু'টিকে

স্বামীর পার্শ্বে রাখিয়া রমণী এমনভাবে তাহার সেবা করিত যে, তাহাতে দরিদ্র কৃষকের প্রাণ স্বর্গীয় সুখে ভরিয়া উঠিত।

অভাগা রমণী অধিক দিন স্বামীর সেবা করিতে পারিল না। তাহাকে এবং শিশু সন্তান দু'টিকে রাখিয়া ধনঞ্জয় সহসা পরলোকে প্রস্থান করিল। রামসুন্দর ভেলামারী হইতে ফিরিয়া আসিবার পরবর্ত্তী আশ্বিন মাসে ধনঞ্জয়ের কাল হইল। অসহায়া রমণী পুত্র দুইটিকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িল। পিত্রালয়ে তাহার এক ভ্রাতা ছিল, তাহার অবস্থা তত ভাল নহে। ধনঞ্জয়-পত্নী তাহাকে সংবাদ দিয়া আনাইল এবং কোনমতে স্বামীর শ্রাদ্ধটি সমাধা করিল। ভ্রাতা তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিলে সে কহিল,—"দাদা এখানে তবু কিছু জমি আছে। এবার ত তাতে ধান ভালই আছে। ঘরে আনতে পারলে আমার বছর চ'লে যাবে। যতদিন এখানে থাকতে পারি, থাকি। তারপর, কষ্ট হ'লে, কাজেই তোমার কাছে যাব।"

পাষণ্ড গোপাল বহু দিবস পূর্ব্ব হইতেই ধনঞ্জয়ের পত্নীকে কু নয়নে দেখিত। ধনঞ্জয়ের স্ত্রীর রূপ ছিল। যে দিন সে বিধবা হইল, গোপালের অন্তঃকরণে সেই দিনই পাপবহ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ধনঞ্জয়ের শ্রাদ্ধের সময়ে গোপাল অযাচিতভাবে অনেক কাজ কর্ম্ম করিয়াছিল। সরলা রমণী ইহার কোন কদর্থই বুঝিতে পারে নাই। শ্রাদ্ধের পরে গোপাল যখন ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃই বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তখন তাহার সন্দেহ হইল। ধনঞ্জয়-পত্নী গোপালের সমক্ষে বাহির হইত না; কিন্তু গোপাল তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সম্বোধন করিয়া সর্ব্বদাই আসিয়া সংবাদ লইত এবং আত্মীয়তা দেখাইত।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে গোপাল ধনঞ্জয়-পত্নীকে একাকিনী পাইয়া তাহার কদর্য্য প্রস্তাব করিয়া বসিল। রমণী শুনিবামাত্র শিহরিয়া

উঠিল। তাহার মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইল। গোপাল সেখানে তিষ্ঠিতে পারিল না। গোপাল চলিয়া গেলে, ধনঞ্জয়-পত্নী অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। শেষে ভগবানের নিকট আত্মরক্ষার্থ প্রার্থনা জানাইয়া নিকটস্থ এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে গেল। পাড়ার এক বুড়ী ধনঞ্জয়ের মৃত্যুর পর হইতে রাত্রিতে তাহার বাড়ীতে শুইত। ধনঞ্জয়ের স্ত্রী প্রতিবেশী-পত্নীকে অনুরোধ করিল যে, আজি হইতে তোমার একটি ছেলে যাইয়া রাত্রিতে যেন আমাদের বাড়ীতে শুইয়া থাকে। প্রৌঢ়া প্রতিবেশী-পত্নী তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে গোপালের ব্যবহার বর্ণনা করিল। প্রতিবেশিনী শুনিয়া গোপালের উদ্দেশে নানারূপ গালিবর্ষণ করিয়া কহিলেন,—"আমার নবীনকে কহিয়া দিব, সে যাইয়া রাত্রিতে তোমার বাড়ীতে শুইয়া থাকিবে। তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমার এক নবীন অমন সাত গোপালকে ঠেঙ্গাতে পারে। একখানা লাঠি নিয়ে নবীন তোমার দাওয়ায় শুয়ে থাক্‌বে। আর মা কথাটা একবার ওদের বাড়ীর গিন্নিকে বলে আসা ভাল। গিন্নিটি কর্ত্তার মত নয়।"

ধনঞ্জয়ের স্ত্রী বলিল,—"আজ রাত হয়েছে। কাল যা'ব।"

প্রতিবেশিনী উত্তর করিল,—"হাঁ, কাল সকালেই বলে এস।"

ইহার পরদিন প্রভাতে রমণী যাইয়া রামসুন্দরের স্ত্রীর নিকটে উপস্থিত হইল এবং কহিল,—"আমি একটা কথা বল্‌তে এসেছি।" রামসুন্দরের স্ত্রী একটু সরিয়া আসিলে বিধবা তাহার মনের কথা কহিতে লাগিল :—"মা, যে অবস্থায় আমি গ্রামে আছি, তা'ত দেখ্‌তেই পাচ্ছেন ; কিন্তু আর যেন থাক্‌তে পারিনে।"

রামসুন্দরের স্ত্রীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, হয় তাঁহার স্বামী, না হয় আবদুল বা গোপাল, অসহায়া বিধবার প্রতি কোন

অত্যাচার করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েছে যাদবের মা ?" ধনঞ্জয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম যাদব, কনিষ্ঠের নাম মাধব। রমণী উত্তর করিল,—"তোমাদের গোপাল আমার জাত মারতে চায়। কপাল পুড়ে যাওয়ার পর থেকে আমি কত বলে কয়ে কেশবের পিসিকে এনে রাত্রে আমার কাছে শোওয়াই, আর ছেলে দুটিকে নিয়ে পড়ে থাকি।

"গোপাল প্রায়ই আমাদিগের বাটীর উপর দিয়ে আনাগোনা করে। সময়ে সময়ে যাদব ও মাধবকে ডাকে। ডেকে দু চারিটা কথা কয়। কাল সন্ধ্যার সময়ে যেয়ে যা বল্লে—আর কি বলবো না, পরমেশ্বর করেন ওর ঐ মুখে যেন কুষ্ঠব্যাধি হয়, ঐ জিব যেন খসে পড়ে—শেষে নবীনের মার কাছে যেয়ে কেঁদে পড়লাম ; তিনি নবীনকে আমাদের দাওয়ায় শুয়ে থাকতে বললেন।—রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করব না বলে কাল আর আসিনি। আপনি একটু দৃষ্টি না রাখলে আমি ভিটেয় থাকতে পারবো না।"

রমণী অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিল।

রামসুন্দরের পত্নীর প্রাণে লাগিল। তিনি বিধবাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন,—"যাও তুমি ঘর যাও। ও নচ্ছার গোপাল যাতে গ্রামছাড়া হয়, আমি তার চেষ্টা করিব।"

পঞ্চদশ অধ্যায়।

রামসুন্দরের স্ত্রী সেই দিনই স্বামীর কাছে গোপালের কথা উত্থাপন করিলেন এবং কহিলেন, —"ওকে তাড়াও।"

রামসুন্দর বলিলেন,—"ও তোমার করেছে কি?"

গৃহিণী। আমার কি করবে? গ্রামের লোকের যা কচ্ছে তাতেই স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধা হচ্ছে।

রা। কার কি করেছে?

গৃ। ও আবার কার কি করেছে তাও জিজ্ঞাসা কর! ত্রিলোচন দাসকে সর্ব্বস্বান্ত করলে কে? মণ্ডল বাড়ীর কর্ত্তাকে সেই সেরপুরে না কি পুরে নিয়ে মেরে ফেল্লে কে?

রা। এসব কথা তোমায় বলে কে?

গৃ। যেই বলুক না,—ও পাপ যে তোমাতেই অর্শাবে।

রা। পাপ পুণ্যের পরামর্শ যখন তোমার সহিত কর্ত্তে যাব, তখন ব'লো।

গৃ। তা আমার সঙ্গে পরামর্শ করবে কেন? পরামর্শের উপযুক্ত লোকই তোমার আবদুল আর গোপাল।

রা। আবদুল আর গোপাল তোমার চক্ষুঃ শূল হ'ল কেন?

গু। এমন লোকও চক্ষুঃশূল হবে না? গ্রামের লোকে বোধ হয় গোপালের পিণ্ডি না চট্‌কে, আর আবদুলের গোর না দিয়ে, জল গ্রহণ করে না। সঙ্গে সঙ্গে কি তোমাকেও শাঁপে না? আবদুল ও গোপাল ত তোমার জোরেই মানুষকে মাড়িয়ে চলে।

রা। তুমি যে ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়ে উঠ্‌লে দেখ্‌ছি।

গু। কুমীর ত বটেই। যাই হ'ক আমার একটা কথা রাখ। আবদুল ও গোপালকে তাড়াও।

রা। আজ এ কথা তোমার মনে উঠ্‌লো কেন? ত্রিলোচন দাসের মামলা, মধু মণ্ডলের মোকদ্দমা সে ত অনেক কাল চুকে গেছে।

গু। ত্রিলোচন ও মধু মণ্ডলকে যে অমন কর্‌তে পারে, সে গরীব গুরুবোকে কি করবে তা কি বুঝ্‌তে পার না?

রা। কি করবে তা বুঝ্‌বো কেমন করে? কিছু ক'রে থাকে ত বলই না ছাই।

গু। করেছে বই কি?

রা। কি?

গু। ধনঞ্জয় দাস মরেছে সেত ছ'মাসও হয় নি। কাল সন্ধ্যার সময়ে যেয়ে গোপাল তার স্ত্রীকে—বলেছে। মনে করেছে গরীব হলেই ভ্রষ্টা হবে,—জাত নাশা হারামজাদা—সে যেদোর মা আজ সকালে এসে কেঁদে পড়েছে।

রামসুন্দরের ইন্দ্রিয় দোষ ছিল না। গোপালের এ দোষ ছিল তাহা তিনি জানিতেন। তিনি কহিলেন,—"এই কথা, তা বল্লেই হয়, আজই আমি গোপালকে শাসন করে দেবো, যা'তে ও ধনঞ্জয়ের বাড়ীর কাছ দিয়ে না যায়।"

গৃ। শাসন টাসন নয় ওকে এক বারে তাড়াও।

রা। এযে তোমার ভয়ানক আবদার।

গৃ। একটা আবদার না হয় রাখ। আমি ত তোমার স্ত্রী।

রা। রাখ্‌বার মতন হলে রাখ্‌তাম।

গৃ। গোপালকে তুমি ছাড়্‌তে পার্‌বে না?

রা। না। আচ্ছা মেয়ে মানুষের অত জিদ্‌ কেন?

গৃ। জিদ্‌ করলেও ত তুমি রাখ্‌ছ না?

রা। আমি কি রকম লোক রাখি না রাখি তাতে তোমার এসে যায় কি?

গৃ। এসে যায় বলেই বল্‌ছি। সাধ করে পাপের বোঝা বাধ্‌ছ।

রা। সাধে মানুষে বলে না, যে বানর, কুকুর, আর মেয়ে মানুষ, নাই দিলেই কাঁধে চড়ে।

গৃ। এতে কাঁধে চড়া হ'ল?

রা। আর কাঁধে চড়্‌বার বাকি কি? দুবেলাই বক্তৃতা ঝাড়।

গৃ। আর কিছু বল্‌বো না। সাম্‌নে থেকে শুনা যায় না, আর দেখা যায় না, তাতেই দু এক কথা বলি।

রা। না শুন্‌তে পার, দেখ্‌তে পার, চলে গেলেই হয়।

গৃ। তা তোমার তাই ইচ্ছা বটে। আমি গেলে ভাল থাক ত আমি চলে যাই।

রা। তা যাও, রোজ রোজ ঘ্যানোর ঘ্যানোর ভাল লাগে না। ঘরের মাগ্‌ আবার উপদেশ দেবে এ সহ্য হয় না।

গৃ। দাও আমাকে এক খানা নৌকা করে। আমি কালই বাপের বাড়ী যাব। তুমি তোমার গোপালকে আর আবদুলকে নিয়ে থাক।

রা। তোমার মত স্ত্রী সংসারে না থাকাই ভাল।

গ্য। জগদীশ্বর করুন যেন আর আমাকে ফিরে না আস্‌তে হয়।

গৃহিণীর চক্ষে জল আসিল।

রামসুন্দর সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বিরক্তির সহিত উঠিয়া গেলেন।

সে দিন তিনি স্ত্রীর সহিত আর বাক্য-ব্যয় করিলেন না। ভেলা-মারীর ব্যাপারে তাঁহার মন অসুস্থ ছিল। তিনি মনে করিলেন, অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য এমন মুখরা স্ত্রীকে দূরে রাখাই ভাল।

পর দিন প্রভাতে নৌকা আসিল। গৃহিণী কন্যাটিকে লইয়া পিত্রা-লয়ে গেলেন।

রামসুন্দরের পুত্র কলিকাতায় পড়িতেছে। ভ্রাতৃজায়া কয়েক মাস হইল কাশী চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং রামসুন্দর একাকী বাড়ীতে রহিলেন। গোপাল, আবদুল এবং দু' একজন ভৃত্য তাঁহার কাছে রহিল।

রামসুন্দর বুঝিতে পারিলেন না যে, তিনি ইচ্ছা করিয়া ঘরের লক্ষ্মীকে এমন অনাদরের সহিত বিদায় করিলেন। বঙ্গে রামসুন্দরের ন্যায় অনেক পামর কেবল তাহাদের গৃহিণীর পুণ্যেই অন্ন পাইয়া থাকে। বিধাতার নির্ব্বাচনে অথবা ভারতের ভূমির গুণে অনেক সাধ্বী রমণী এইরূপ পাষণ্ডের অঙ্কশায়িনী হইয়া থাকেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভেলামারীর ব্যাপারে রামসুন্দরের মন খারাপ হইয়াছিল। জীবনে কখনও তাঁহার এত অর্থ ক্ষতি হয় নাই। প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া রামসুন্দর ভেলামারীতে যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ অর্জ্জুনদাসের এবং তাঁহার নিজের লোক জমায় ব্যয় হইল। রামসুন্দর ভাবিলেন, লোকগুলিকে মারিয়া ছাড়িয়া দিলেই হইত। এজাহার দেওয়াতেই বিপদগ্রস্ত হইলাম। শালার দারগা যে ঘুস নেয় না, এ কথা কেমন ক'রে বুঝবো? যা'ক এমন ক'রে আর ধরা দেব না। গ্রামে বসিয়া এমন লোকের উপর অত্যাচার করিব, যার রাজদ্বারে যাইবার শক্তি সামর্থ্য বা সম্ভাবনা নাই। সমকক্ষ বা প্রধান লোককে জব্দ করিতে হইলেই কৌশলের প্রয়োজন। দরিদ্রকে পীড়ন করা প্রকাশ্যভাবেও চলে।

প্রথমতঃ ধনঞ্জয়ের বিধবা পত্নীর প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। গোপাল উস্কাইয়া দিল। ধনঞ্জয়ের স্ত্রীর জন্যই ত গৃহিণীকে তাড়াইতে হইয়াছে। রামসুন্দর দেখিলেন, ধনঞ্জয়ের তিন চারি বিঘা জমিতে হৈমন্তিক ধান পাকিয়াছে। তাঁহার মনে হইল, ধনঞ্জয়ের ধানগুলি কাটিয়া লইতে হইবে। ধনঞ্জয় তাঁহারই প্রজা ছিল। পাঠক জানেন,

ধনঞ্জয়ের বিধবা পত্নী আর তাহার দুই শিশু-সন্তান বই কেহ নাই। এমন লোকের প্রতি অত্যাচার করা বড়ই সহজ। রামসুন্দর মহাজনী খাতা বাহির করিলেন। দেখিলেন, ধনঞ্জয় একবার পাঁচ টাকা ধার করিয়াছিল। সে তাহা সুদে আসলে শোধই করিয়াছিল। কিন্তু গোপাল একরূপ হিসাব করিয়া আড়াই টাকা তিন টাকা পাওনা করিয়া রাখিয়াছে। রামসুন্দর মনে মনে স্থির করিলেন, লোকের কাছে ইহাই বলা যাইবে। ধানটা একবার কেটে নিলেই মাগী গ্রাম ছেড়ে পালাবে। ঐ জমিগুলি আর এক জনের সঙ্গে নূতন বন্দোবস্ত করিলেই বিলক্ষণ দশ টাকা পাওয়া যাইবে।

অনাথা বিধবা এ সব কিছুই জানে না। ঐ জমি টুকুই তার সম্বল। তাহার স্বামীর অর্জ্জিত শস্য আর কেহ লইয়া যাইতে পারে এ ধারণা তাহার মনেই আসে নাই। ধনঞ্জয়ের মৃত্যুর পরে অবস্থা দেখিয়া গ্রামের লোক অনেকেই তাহাকে দয়া করিত। ধানগুলি পাকিয়াছে দেখিয়া, সে কয়েক জন প্রতিবেশীকে তাহা কাটিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে। তাহারা বলিয়াছে, আমরা সকলে মিলিয়া একদিন যাইয়া তোমার ধান কাটিয়া দিয়া আসিব। তোমার কিছুই দিতে হইবে না।

যে দিন তাহাদের আসিবার কথা, তাহার পূর্ব্ব দিন প্রাতঃকালেই যাদবের মা দেখিল, তাহার ক্ষেতে ধান কাটিতে মানুষ লাগিয়াছে। জমিগুলি বাড়ীর অতি নিকটে। সে মনে করিল, গ্রামের লোকেরাই বোধ হয় অবসর এবং সুবিধা পাইয়া একদিন আগে আসিয়াছে। কিন্তু তাহাকে বলিয়া যায় নাই বলিয়া সে ভাবিল, এক বার যাইয়া দেখিয়া আসি। বিনা পয়সায় আর কারও ধান কেটে দিলে খাবারটাও ত পেত। আমি যে কিছুই দিব না।

ক্ষেত্রের নিকটে আসিয়া যাদবের মা দেখিল যাহারা ধান কাটিতেছে,

তাহারা তাহার পরিচিত লোক নহে। তাহার মনে খট্‌কা লাগিল। অৰ্দ্ধ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া সে যাদবকে দিয়া জিজ্ঞাসা করাইল, তোমরা এ জমির ধান কাটিতেছ কেন?

তাহারা উত্তর করিল,—কর্ত্তা হুকুম দিয়েছেন। ধনঞ্জয় তার টাকা ধারিত, সেই টাকার জন্য এই ধান কেটে নিচ্ছেন।"

কর্ত্তা বলিলে রামসুন্দরকে বুঝাইত। কর্ত্তা ধান কাটাইতেছেন শুনিয়া বিধবার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার রমণী-জন-সুলভ লজ্জা কোথায় পলায়ন করিল। যাহারা ধান কাটিতেছিল, তাহাদের সম্মুখে আসিয়া কহিল,—"আগে আমাকে কাট, তারপর আমার ধান কাটিও।"

যাহারা ধান কাটিতেছিল, তাহারা দস্যু নহে। পারিশ্রমিকের লোভে রামসুন্দরের কাজ করিতে আসিয়াছিল। তাহারা প্রথমে বুঝিয়াছিল, বিধবা এ ধান কাটায় সম্মত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার ক্রন্দন শুনিয়া হস্তস্থিত অস্ত্র ত্যাগ করিল এবং একজন কহিল,—"যা রে একজন যেয়ে কর্ত্তাকে খবর দে।"

রামসুন্দরের প্রাতঃস্নান হইয়া গিয়াছে। খড়ম পায়ে মালা টপ্ টপ্ করিতে করিতে তিনি আসিয়া জমির এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। যাদবের মা তাঁহাকে দেখিয়াই নিকটে আসিল, এবং চরণ ধরিতে গেল। 'ছুঁস্‌নে ছুঁস্‌নে,' বলিয়া কর্ত্তা সরিয়া গেলেন! বিধবা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"কর্ত্তা কি আমার এই ধান কাটবার হুকুম দিয়েছেন? কর্ত্তা যে টাকা পাবেন তা'ত এক দিনও শুনিনি।"

"তা আবার তুই শুনবি কি? তা জান্‌ত ধনঞ্জয়" বলিয়া রামসুন্দর উত্তর করিলেন।

রমণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"আজ্ঞে কত টাকা?"

"তাকি তোর কাছে নিকেস দিতে হবে নাকি ?" বলিয়া রামসুন্দর বিলক্ষণ বিরক্তি প্রকাশ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন—"কাট্‌রে ধান কাট্।"

বিধবার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল, সে পুনরায় বাধা দিল। যে স্থান পর্য্যন্ত ধান কাটা হইয়াছিল, তাহার সম্মুখে যাইয়া বসিয়া পড়িল। ধান কাটা লোকের মধ্যে দু একজন উঠিয়া আসিল, দু একজন অস্ত্র হস্তে বসিয়া রহিল। একজন বৃদ্ধ শ্রমজীবী কহিল,—"এ ধান আমি কাট্‌তে পারব না ;—সকলেরই ত ব্যাটা পুত আছে।"

রামসুন্দর, তোমার কি ব্যাটা পুত নাই ? এই নিরক্ষর শ্রমজীবীর যে ধর্ম্মভয় আছে, তাহা তোমার থাকিলে তুমি বিধবার সর্ব্বনাশ করিতে পারিতে না।

রামসুন্দর দেখিলেন, বেটীকে জমি হইতে সরাইতে না পারিলে সুবিধা নাই। দু তিন বার শ্রমজীবীদিগের উপর তম্বি করিলেন,—"দে না শালারা মাগীকে তুলে, দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌নে কেমন ন্যাকা হারামজাদী।" তাহারা কেহই কিন্তু তাহার গাত্র স্পর্শ করিল না। রামসুন্দর স্বয়ং অগ্রসর হইতে লাগিলেন,এবং রমণীর নিকটবর্ত্তী হইয়াই আরম্ভ করিলেন, 'সরে যা হারামজাদী, ধান কাট্‌তে দে। আমার পাওনা গণ্ডা শোধ হয়ে যদি কিছু থাকে, তা তোকে দিব"।

বিধবা তখন বিধাতা এবং মৃত স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া রোদন করিতে ছিল। রামসুন্দরের চরণ নিকটে পাইয়া দুই হস্তে তাহাই ধরিল, এবং পুনঃ পুনঃ কাতরতার সহিত তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিল। রামসুন্দর কেবল "ছাড়্ পা, ওঠ্, বেরো জমি থেকে" এই রূপ বোল ঝাড়িতে আরম্ভ করিলেন। জননীর অবস্থা দেখিয়া যাদব, মাধব দুই পুত্র তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

এই দৃশ্য দেখিয়া শ্রমজীবীদিগের দু এক জনের চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। রামসুন্দর ছাড়িবার লোক নহেন। পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন,—"আয়না শালারা, সং এর মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন?" তাহারা দু এক জন অগ্রসর হইতেই ধনঞ্জয় পত্নী পুনরায় জোরে কাঁদিতে ও চেঁচাইতে আরম্ভ করিল। রামসুন্দরের আর সহ্য হইল না। "মর শালি," বলিয়াই তিনি পা হইতে খড়ম তুলিয়া লইয়া সেই অসহায়া বিধবাকে বিষম প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। রমণীর পৃষ্ঠ দেশ ফুলিয়া গেল। কান হইতে রক্ত বাহির হইল। তথাপি সে ধানের কথা ভুলিল না। জ্যেষ্ঠ পুত্র যাদব কাছে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল ও কহিল,—"মা আর ধানে কাজ নাই, চল্ আমরা ঘর যাই, যে মার মেরেছে তোকে।"

যে বৃদ্ধ শ্রমজীবী পূর্ব্বে কহিয়াছিল এ ধান আমি কাটতে পারবো না, সে এই দৃশ্য দেখিয়া অস্ত্র লইয়া পলায়ন করিল।

ধনঞ্জয়পত্নী দু এক বার প্রহার স্থানে হাত বুলাইয়া মাটী হইতে উঠিল, এবং পুনরায় রামসুন্দরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার দুই পুত্র আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, এবং কহিতে লাগিল,—"ও দিকে যাস্‌নে মা, তোকে আবার মারবে।" রমণী, তাহাদিগকে সরাইয়া রাখিয়া,আবার আসিয়া রামসুন্দরের পায়ের উপর পড়িল, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"কর্ত্তা মেরেছেন মেরেছেন বেশ করেছেন, জমিদার আপনি—ও মার নয়, আমার আশীর্ব্বাদ হয়েছে, কিন্তু আমার ধান গুলি নেবেন না—ধান ক'টী নিলে আমি এ ছেলে দু'টীকে কি খাওয়াব? এক বার এদের মুখ পানে চান।"

রামসুন্দর এবার আর রমণীকে প্রহার করিলেন না, কিন্তু পুনঃ পুনঃ

শ্রমজীবীদিগকে ধান কাটিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রামসুন্দরের বাড়ী হইতে তাঁহার পেয়াদা নৃশংস আবদুল আসিয়া উপস্থিত হইল। রামসুন্দর এক জন মজুরকে দিয়া আবদুলকে ডাকাইয়াছিলেন। আবদুল আসিয়াই মজুরদিগের এক জনের হস্ত হইতে এক অস্ত্র কাড়িয়া লইল, এবং তাহাদিগকে ডাকিয়া ধান কাটিতে অগ্রসর হইল। অসহায়া রমণী পুনরায় বাধা দিতে গেল, কিন্তু আবদুল তাহাকে এমন অকথ্য ভাষায় গালি দিতে আরম্ভ করিল, আর অস্ত্র হস্তে তাহার সমক্ষে এমন বীভৎস ও কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করিতে লাগিল, যে ধনঞ্জয় পত্নী আর সেখানে তিষ্ঠিতে পারিল না। আবদুলের স্বভাব গ্রামের সকলেই জানিত। বিধবা এক বার মাত্র রামসুন্দরের দিকে চাহিয়া "কর্ত্তা এই করলেন ?" বলিয়া ছেলে দু'টীকে লইয়া বাড়ী মুখে চলিল। যাইবার সময়ে কহিতে কহিতে গেল—"কা'ল আমি জমির ধান কাটাব, গ্রামের দশ জনের দুয়ারে যাইয়া বলাতে সকলেই ঘরের খেয়ে আমার ধানগুলি কেটে দিতে চেয়েছিল। আর আজ তাই এমন ক'রে নিয়ে গেল। বাবা, ত্রৈলোক্যের নাথ, গরিবের তুমি বই আর কে আছে বাবা, তুমিই এর বিচার করো !"

জগদীশ ! মানুষের প্রতি মানুষের এমন অমানুষিক অত্যাচারে কি তোমার সিংহাসন টলে না ? টলিলে মানুষকে তুমি তাহা বুঝিতে দাও না কেন ? অনাথা বিধবার এবং তাহার অসহায় পুত্রদ্বয়ের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লওয়ায় নিষ্ঠুর রামসুন্দর ও আবদুলের মাথায় এই ধানের ক্ষেত্রেই বজ্রপাত হইল না কেন।

আবদুলকে উপদেশ দিয়া, রামসুন্দর মালা টিপিতে টিপিতে বাড়ী ফিরিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ধনঞ্জয়পত্নী গ্রামের অনেকের কাছে কাঁদাকাটা করিল, এবং তাহার উপর যে ঘোর অত্যাচার হইয়াছে তাহা জানাইল। কিন্তু গ্রামে এমন লোক কেহই ছিল না যে, রামসুন্দরের বিরুদ্ধে তাহাকে সাহায্য করে। তাহার অবস্থা দেখিয়া সকলেই দুঃখিত হইল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কথা কহে, কাহার সাধ্য?

তমলুকের নিকটবর্ত্তী পায়রাচালি গ্রামে ধনঞ্জয়ের শ্বশুর-বাড়ী। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ধনঞ্জয়ের এক শ্যালক ছিল। রমণী গত্যন্তর না দেখিয়া ভাইয়ের কাছে যাইয়া থাকিবে স্থির করিল, এবং যে দিন তাহার ধানগুলি অপহৃত হয়, তাহার দু' দিন পরেই সে পায়রাচালিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাই তাহার মুখে রামসুন্দরের অত্যাচারের বিবরণ শুনিয়া, এবং তাহার শরীরে প্রহারের চিহ্ন দেখিয়া, বড়ই ব্যথিত হইল। সে তমলুকের একজন মোক্তারের বাসায় চাকরী করিত। সেই দিনই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এমন অত্যাচারের কি কোন প্রতিকার নাই? মোক্তার তাহাকে তাহার ভগিনীকে লইয়া আসিতে

বলিলেন। পরদিন ধনঞ্জয়ের স্ত্রী শিশু পুত্র ড়'টীকে সঙ্গে লইয়া, তমলুকে সেই মোক্তার বাবুর বাসায় আসিল।

মোক্তার বাবুর হৃদয় ছিল। রমণীর অঙ্গে নিষ্ঠুর প্রহারের চিহ্ন দেখিয়া এবং তাহার মুখে ঘটনার বিবরণ শুনিয়া তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। তিনি কহিলেন "আজই দরখাস্ত দেও। তোমার একটী পয়সাও লাগিবে না। এ মোকদ্দমায় যাহা ব্যয় লাগে তাহা সমস্তই আমি দিব।"

রমণী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আপনার অসহায় অবস্থা এবং নীরব কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। সেই দিনই ফৌজদারিতে নালিশ হইল। হাকিম, রামসুন্দর এবং আবদুলের নামে সমন দিলেন।

রামসুন্দর স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, ধনঞ্জয়ের বিধবা পত্নী কখনও তাঁহার নামে নালিশ করিতে পারে বা করিবে। যদি করে, সে কেবল সেই ভগবানের কাছে। রাজদ্বারে যাইবার সামর্থ্য তাহার কোথায়? সহসা সমন পাইয়া তাঁহার চমক লাগিল। ড়'তিন বার সমন গুলি পরীক্ষা করিলেন, দেখিলেন সত্যসত্যই তমলুকের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের আদালতের সমন। রামসুন্দরের ভয় হইল। পাপীর মনে সর্ব্বদাই ভয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয় তাহার বোধ হয় মৃত্যুকালে হইয়া থাকে। কেননা মানুষকে অনেক সময় ফাঁকি দেওয়া যাইতে পারে। অনেক ড়ুষ্কার্য্য মানুষের অসাক্ষাতে করা সম্ভব; কিন্তু মৃত্যুর পরে যে রাজ্যে যাইবার কথা সেখানে ফাঁকির কারবার নাই। কিছুই লুকাইবার উপায় নাই। তাই সেই সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্ব শক্তিমানের দণ্ডের কথা স্মরণ করিয়া পাপী বড়ই শঙ্কিত ও অনুতপ্ত হইয়া পড়ে। রামসুন্দরের ন্যায় লোকের কি মৃত্যুর পূর্ব্বেও অনেকবার এই ভয় মনে উদয় হয় না?

রামসুন্দরের এক ভরসা এই যে মাগী সাক্ষী দিতে পারিবে না। মোকদ্দমার প্রথম ধার্য্য দিনে তিনি আবদুলকে উপস্থিত করিয়া দিলেন, নিজে হাজির হইলেন না। কিন্তু বাদীর পক্ষের মোক্তার প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করাইলেন। আর গরহাজির থাকিয়া লাভ নাই, দেখিয়া রামসুন্দর দ্বিতীয় দিনে আদালতে উপস্থিত হইলেন।

রামসুন্দর দেখিলেন, বাদীর সাক্ষীস্বরূপে সেই বৃদ্ধ শ্রমজীবী আসিয়াছে। এই ব্যক্তি তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া, অস্ত্র লইয়া পলাইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াই রামসুন্দরের বুক আধ হাত বসিয়া গেল। কেমন করিয়া সে আসিয়া ঔমলুকে উপস্থিত হইল, রামসুন্দর ইহা বুঝিতে পারিলেন না। সে রামসুন্দরের প্রজা, কিংবা বাধ্য লোক নহে। রামসুন্দরের মোক্তার তাঁহাকে বুঝাইয়া ছিলেন যে, এমন মোকদ্দমায় হাকিমের বিশ্বাস হইলে, এক বাদিনীর এজাহারে নির্ভর করিয়াই তিনি আসামীকে দণ্ড দিতে পারেন। রামসুন্দর ইহাতেই বিলক্ষণ চিন্তিত হইয়াছিলেন। সাক্ষী দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। বাদিনী তাহার এজাহার দিতে দিতে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পৃষ্ঠের খড়মের দাগ হাকিমকে দেখাইয়া, রামসুন্দরকে দেখাইয়া দিল। ক্ষণেকের জন্য আসামীর মোক্তারেরও তাহাকে জেরা করিতে প্রাণ সরিল না। মক্কেলের অনুরোধে অবশেষে তিনি উঠিলেন। কিন্তু যতই জেরা করেন, ততই দেখেন যে বাদিনীর উত্তরের দ্বারা তাহার অভিযোগের সত্যতা দৃঢ়ীভূত হইয়া আসে। মোক্তার বসিয়া পড়িলেন। ইহার পরে সেই শ্রমজীবী এবং ধনঞ্জয়ের ছ'বৎসর বয়স্ক পুত্র যাদব আসিয়া সাক্ষ্য দিল। হাকিম, রামসুন্দর ও আবদুলের নামে অভিযোগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কোন

সাফাই সাক্ষী দিবে কি না। রামসুন্দরের মোক্তার পূর্ব্বেই তাহাকে সাফাই দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু রামসুন্দর তাহা শুনিলেন না। আবদুলের শ্রেণীর অনেক লোক তাঁহার বাধা ছিল। তিনি তাহাদের দশ বার জনের নাম করিলেন। ইহারা অনেকেই তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। রামসুন্দরের মোক্তার ৪।৫ জন সাক্ষী দিয়াই আর দিতে দিলেন না। ইহার পরে বাদী আসামীর পক্ষে সওয়াল জবাব হইল। রামসুন্দর যতক্ষণ কাটগড়ায় ছিলেন, মনে মনে কেবল ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতেছিলেন।

ভগবান এবার বাচাইয়া দাও এমন কাজ আর করিব না, মনে মনে এমন কথাও বলিয়াছিলেন কি না কে বলিবে?

সওয়াল জবাব শেষ হইলে হাকিম রায় লিখিতে বসিলেন। রামসুন্দর বিড় বিড় করিয়া জপ করিতেছেন। কিছুকাল পরেই হাকিম আসামীদিগকে বাঙ্গলায় রায় বুঝাইয়া দিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, এই মোকদ্দমায় বাদিনীর এজাহারই যথেষ্ট। তাহার সরল সাক্ষ্য এবং শরীরের প্রহারের চিহ্ন ছাপাই সাক্ষীদের ন্যায় শত সাক্ষীর উক্তি অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্। ধান তাহার স্বামীর অর্জ্জিত ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আসামীরা এক অনাথা বিধবার উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে, লঘু দণ্ডে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না। রামসুন্দরের সশ্রম তিন মাস কারাবাস ও এক শত টাকা অর্থ দণ্ড, আর আবদুলের এক বৎসর কারাদণ্ডের হুকুম হইল। ইহার মধ্যে একমাস কাল নির্জ্জন কারাবাস। অর্থ দণ্ড না দিলে রামসুন্দরকে আরও দুই মাস জেলে থাকিতে হইবে। জরিমানার টাকা হইতে বাদিনী ৫০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পাইবে।

রামসুন্দর ক্ষণকালের জন্য ইষ্ট মন্ত্র ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার অন্ত-

রাস্তা শুকাইয়া গেল, ধান কাটার মোকদ্দমায় এমন শাস্তি হইবে, ইহা তিনি কখনও মনে করেন নাই।

আর সেই দণ্ড এক অনাথা বিধবার নালিশে। জেলে যাইতে যাইতে রামসুন্দর ভাবিতে লাগিলেন "শেষকালে পচা শামুকে পা কাটিলাম"। ভগবানকে এত ডাকিলাম তা'তে কিছুই ফল হইল না।

রামসুন্দর, দুঃখিনী বিধবা কি ভগবানের বিশ্বরাজ্যের প্রজা নহে? সে যে নিষ্পাপ হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিয়াছে!

অষ্টাদশ অধ্যায়।

রামসুন্দর নিজের এবং আবদুলের প্রতি দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে সেসন জজের সমীপে আপিল করিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না দেখিয়া হাইকোর্টে মোসান করিলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি কোন ফল পাইলেন না। রামসুন্দরকে নির্দ্ধারিত কাল জেলে থাকিতে হইল। রামসুন্দর, শারীরিক মানসিক মর্ম্মান্তিক ক্লেশ ভোগ করিলেন। মহকুমার জেলে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াই রামসুন্দরকে মেদিনীপুরের জেলে আসিতে হইল। সেখানে জাতি বাঁচাইবার অথবা ইষ্ট দেবতার নাম লইবার সুযোগ অতি অল্প। কিন্তু জেলর বাবুর অনুগ্রহে অথবা রামসুন্দরের অর্থের জোরে তাঁহাকে বিশেষ পরিশ্রমের কোন কাজ করিতে হয় নাই। রামসুন্দর বাতি সাজাইতেন এবং পরিষ্কার করিতেন।

যতদূর সম্ভব রামসুন্দর আবদুলের অসাক্ষাতে এই সমস্ত কর্ম্ম করিতেন। কিন্তু যখনই তিনি বাতি লইয়া বসিতেন, তখনই মনে হইত, ঐ বুঝি আবদুল আসিতেছে! জেল হইতে বাহির হইবার সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, রামসুন্দরের 'কেমন করিয়া মানুষকে মুখ দেখাইব?' এই ভাবনা ততই বাড়িতে লাগিল।

দু' একবার বোধ হয় এমনও মনে হইয়াছিল যে একেবারে দেশ-ত্যাগী হইব। আর গৃহে ফিরিব না। শেষে ভাবিলেন, দেশে এমন লোকই বা কে আছে, যাহাকে দেখিয়া লজ্জা হইবে। সবই ত চাষা ভূষা। যা'দের দেখে লজ্জা করবার কথা, তারা ত সব সরে গেছে। এক বরদাকান্ত সে ত এখন প্রায় আমার পোষ্যের মধ্যে।

জেল হইতে বাহির হইয়া রামসুন্দর বাড়ী ফিরিলেন। তিনি গৃহে আসিবার কিয়ৎকাল পরেই বরদাকান্ত আসিয়া দর্শন দিলেন। রাম-সুন্দর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। বরদা-কান্ত বসিলে, রামসুন্দর আরম্ভ করিলেন—"গ্রহের ভোগ ভুগে এলাম আর কি ?"

বরদাকান্ত কহিলেন,—"গ্রহের ভোগ বই কি ? গ্রহের হাত থেকে কাহারও পার পাবার যো নাই। পরম ধার্ম্মিক নল রাজা শনির কোপে পড়ে কি ভোগটাই ভুগলেন। এই জন্যই লোকে গ্রহ স্বস্ত্যয়ন করে।"

রা। রোজ বৈকালে এসে আমাকে একটু ক'রে পুরাণ শোনাবেন। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে।

ব। তা আস্‌ব। পুরাণ শ্রবণ কীর্ত্তন দুয়েতেই ফল।

রা। আর (চারিদিকে চাহিয়া) এখানে ত আর কেউ নাই—মনে করেছি একটা প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বো।

ব। উত্তম কথা। উত্তম কথা।

রা। আমি ত জ্ঞানতঃ কোন অনাচার করি নাই। তবে কি জানেন,—জেল্,—কুস্থান—আর সংসর্গ দোষ হলেও হতে পারে।

ব। তা ত বটেই, আমার খুড়া মহাশয় বল্‌তেন, সংসর্গজা দোষা গুণা ভবন্তি। সংসর্গ দোষ হ'লেই তার প্রতিপ্রসব করা প্রয়োজন।

তা আমি ব্যবস্থা ঠিক করি—যে ক পণ কড়ি লাগ্‌বে, যা' না' লাগবে, যা'তে সংক্ষেপ হয়, তাই করবো।

রা। আজ্ঞে হাঁ, সময়টা তত ভাল নয়। নিজের মনে একটা খুঁৎ খুঁতুনী থাকে, সেই জন্যে, তা নইলে গ্রামের কার সাধ্য যে এ বিষয়ে কথা বলে।—

ব। তাত ঠিকই। তবে ওটা যখন মনে করেছেন, তখন শুভস্য শীঘ্রং, করে ফেলাই ভাল।

রা। আপনি ফর্দ দিলেই আরম্ভ করি।

ব। কাল প্রাতেই ফর্দ দিব।

এইরূপ কথোপকথনের পরে বরদাকান্ত উঠিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে পণ্ডিতের ফর্দ্দ আনিয়া রামসুন্দর সমীপে পেশ করিলেন। খরচ মঞ্জুর হইল। প্রায়শ্চিত্তের জিনিসপত্র সমুদয় খরিদ হইতে লাগিল।

রামসুন্দরের প্রায়শ্চিত্তে বরদাকান্তেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাপ্ত হইল। গ্রামের স্বজাতীয় লোকগুলিও এক বেলা আহার পাইল।

রামসুন্দর প্রায়শ্চিত্ত করিলেন বটে; কিন্তু একবারও তাঁহার মনে আসিল না যে, ধনঞ্জয়ের বিধবা পত্নী এবং তাঁহার নাবালক ত'টি পুত্রকে আনাইয়া তাহাদের জমি ও বাটী ফিরাইয়া দিই। বরদাকান্ত অথবা অন্য কেহই এমন পরামর্শ দিলেন না।

রামসুন্দর ত' দিন পরেই লোকের উপর পুনরায় অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, কিন্তু এবারে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সতর্ক হইয়া এবং ফৌজদারী বাঁচাইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন।

বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে ফৌজদারী বাচাইয়াও এমন অনেক কাজ করা যায়, যাহাতে অল্পদিনের মধ্যেই বড় মানুষ হওয়া যাইতে পারে।

উত্তমর্ণরূপে রামসুন্দর অনেক কৃষককে নিরন্ন করিয়া তুলিলেন। তিনি হাতে না মারিয়া লোককে কেবল ভাতে মারিতে আরম্ভ করিলেন। অনেকের জমি জমা, অনেকের গরু, বাছুর, অনেকের ঘটী, বাটী তাঁহার হস্তগত হইতে লাগিল। বঙ্গের কৃষকের ন্যায় নির্দ্দোষ, নিরীহ ও সহিষ্ণু জাতি বুঝি পৃথিবীতে আর নাই। ইঁহাদের পরিশ্রমেই দেশের সকল লোকের অন্ন সংস্থান, অথচ ইহারাই নিরন্ন। ভূস্বামী, বিশেষতঃ উত্তমর্ণের শোষণে ইঁহাদের শরীরে রুধির বিন্দু থাকে না। তথাপি ইহারা কাঁদে না, নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করে। বঙ্গদেশে রামসুন্দরের ন্যায় উত্তমর্ণ কোন্ স্থানে নাই? কিন্তু টাকার ঋণে শতকরা বার্ষিক ৩৭৷৷০ টাকা সুদ আর ধান্যে শতকরা বার্ষিক পঞ্চাশ মণ হিসাবে চক্র বৃদ্ধির নিয়মে বৃদ্ধি আদায় করিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে, বঙ্গীয় প্রজা মহাজনের বিরুদ্ধে একটী কথাও কহিবে না। রামসুন্দরের ধান এবং টাকা দুই প্রকারের কারবারই ছিল। যে বৎসর ধান্য মহার্ঘ্য হইত, সেবারে তিনি তাহা বিক্রয় করিতেন। আর ধান সস্তা হইলে, সেবারে তাহা কর্জ্জ দেওয়া হইত।

টাকার সুদেও তিনি সুযোগ পাইলে চক্রবৃদ্ধি আদায় করিতে ছাড়িতেন না। তিন মাস, ছ'মাস অথবা এক বৎসরের পরেই সুদের টাকা আসলে যোগ করিতেন; পুনরায় তাহার উপর সুদ চলিত।

রামসুন্দর তাঁহার কাঁচা বাড়ী পাকা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পরকালের স্থান বোধ হয় ক্রমশঃই কাঁচা হইয়া আসিতেছিল।
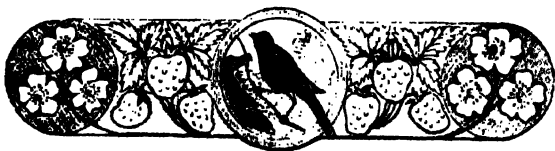
ঊনবিংশ অধ্যায়।

রামসুন্দরের ধনবৃদ্ধি হইতেছিল বটে, কিন্তু মনের শান্তি ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছিল। শান্তি তাঁহার অন্তঃকরণে কোন দিন ছিল কি না সন্দেহ, এখন অশান্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছিল, এইরূপ বলিলেই বোধ হয় ঠিক হয়। রামসুন্দরের মনে সর্ব্বদাই ভয়। জেল হইতে ফিরিয়া আসিবার পর এই ভয় আরও বাড়িয়াছিল। নিকটস্থ পুলিষের পার্ব্বণি বাড়াইয়া দিতে হইয়াছিল। গ্রামে একটি কনষ্টেবল দেখিলে তাঁহার মনে হইত, আবার বুঝি তাঁহার নামে কোন মোকর্দ্দমায় ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। ফলতঃ বাড়ীতে থাকিয়াও তিনি সর্ব্বদা কয়েদীর ন্যায় শান্তি-হারা অবস্থায় বাস করিতেন।

ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার অন্তঃকরণে অনুতাপও উপস্থিত হইত। কিন্তু সে অনুতাপ ক্ষণিক। মনের যে অবস্থা হইলে অন্যায় আচরণ বা পাপ কার্য্যে

বিরক্তি জন্মে, রামসুন্দরের সে অবস্থা এখনও হয় নাই। মনের অশান্তিতে দু,এক সময়ে ভাবিতেন,আর এমন করিয়া মানুষকে ঠকাইব না বা পীড়ন করিব না। সুযোগ পাইলে কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইতেন। রামসুন্দরের কার্য্যে প্রতিবাদ করিতে, বা তাহার ইচ্ছায় বাধা দিতে, গ্রামে লোকই ছিল না। এই সময়ে ত্রিলোচন দাস থাকিলে, বোধ হয়, রামসুন্দর যে অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছিলেন, এই অবস্থায় তাঁহার স্বভাব সংশোধিত হইতে পারিত। সম্মুখে সচ্চরিত্রের আদর্শ, অন্তরে শাসন ভীতি, থাকিলে মানুষের বড়ই উপকার দর্শে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, যাহাদের অর্থ আছে অথচ শাসক নাই, একবার তাহাদের চরিত্র উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলে, আর পরিবর্ত্তনের আশা থাকে না। ইহার কারণ এই যে, সংসারে অপদার্থ লোকের সংখ্যাই অধিক। এমন একটি লোক দেখিলেই অপদার্থেরা আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করে এবং তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অসৎ কার্য্যেও উৎসাহ দিয়া থাকে। গ্রামে আসিয়া, বরদাকান্ত, গোপাল, আবদুল প্রভৃতির ন্যায় অনুচর না পাইলে, রামসুন্দর বোধ হয় এমন ভাবে এত লোকের সর্ব্বনাশ করিতে সাহসী হইতেন না। মধুমণ্ডল এবং ত্রিলোচনকে তিনি ভয় করিতেন। তাঁহাদিগকে সরাইয়া দিয়া তিনি নিজের পায়েই নিজে কুঠার মারিয়াছেন, একথা রামসুন্দর বুঝিতে পারেন নাই। আমরা উপরে যে শাসন-ভীতির কথা বলিয়াছি, তাহা কেবল নিজের গুরুজন অথবা সমশ্রেণীর লোক হইতেই হইয়া থাকে। জগতে চরিত্রের মূল্য এবং বল এতই অধিক যে, সমকক্ষ লোক চরিত্রবান্ হইলে কদাচার ব্যক্তি তাহার সমক্ষে উপস্থিত হইতে ভয় পায়। দুঃখের বিষয় এই যে নিম্নস্তরের লোক সম্বন্ধে একথা খাটে না। রামসুন্দরের দরিদ্র প্রতিবেশী বা প্রজার মধ্যে অনেক চরিত্রবান্ লোক ছিল, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়া তাহারা রামসুন্দরের

কার্য্যের আলোচনা কেবল গোপনে অথবা মনে মনে করিত। রাম-সুন্দরের তাহা গায়ে লাগিবে কেন ?

ক্রমে দরিদ্রের অভিসম্পাতের ফল ফলিতে লাগিল। রামসুন্দরের ঐহিক উন্নতির স্রোতে চিরদিনের মত বাধা পড়িল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জেল হইতে বাহির হইবার পর রামসুন্দর বড়ই সতর্ক ভাবে কাজ কর্ম্ম করিতে ছিলেন। পর বৎসর বর্ষাকালে রামসুন্দর মনে করিলেন, এবার কিছু পাটের কারবার করিব। ইহার দু'এক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই মেদিনীপুরের দক্ষিণ অঞ্চলে পাটের কারবার আরম্ভ হইয়াছে। পাটে বিলক্ষণ লাভ হয় দেখিয়া রামসুন্দর এই ব্যবসায়ে মন দিলেন।

তাঁহার পাট অন্যের প্রায় অর্দ্ধ মূল্যে খরিদ হইল। অনেক কৃষককে ফাঁকি দিয়া তিনি অল্প মূল্যে অধিক জিনিষ খরিদ করিলেন। পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রায় রামসুন্দরের অনুমান পঁচিশ সহস্র মুদ্রার পাট সঞ্চিত হইল। রামসুন্দরের বাড়ীর নিকটেই নদী। মহাজন আসিয়া তাঁহার বাড়ী হইতেই পাট খরিদ করিয়া লইয়া যাইবে, এই বিবেচনায় তিনি সমস্ত পাট বাড়ীর পার্শ্বেই এক গুদামে সজ্জিত রাখিলেন। পাপের ভরা পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল বলিয়াই, একদিন রাত্রিতে, অগ্নি লাগিয়া রামসুন্দরের সেই সমস্ত পাট এবং তাঁহার বাড়ীর অধিকাংশ পুড়িয়া গেল। পাপার্জ্জিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইল। রামসুন্দর একেবারে দমিয়া গেলেন।

এই সময়ে তাঁহার স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। প্রায়শ্চিত্তের সময়েও তিনি স্ত্রীর সংবাদ লন নাই। কন্যাটিও তাহার মাতার সঙ্গে রহিয়াছে। গৃহদাহে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া রামসুন্দরের চিত্ত যেন একেবারেই ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি স্ত্রীকে ও কন্যাকে আনিবার জন্য শ্বশুরালয়ে লোক পাঠা-ইলেন।

রামসুন্দর-গৃহিণী পতি কর্তৃক একরূপ বিদূরিতা হইলেও ইহার পূর্ব্বেই স্বামী সদনে আসিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু রামসুন্দর এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ না লওয়ায় স্বাভাবিক অভিমান বশতঃ আসিতে পারেন নাই। সম্প্রতি রামসুন্দরের বিপদের কথা শুনিয়া তিনি অবিলম্বে যাত্রা করিলেন, কিন্তু রামসুন্দরের ভাগ্যে আর সে সাধ্বী রমণীর সঙ্গ লাভ সুখ ঘটে নাই। রামসুন্দরের স্ত্রী নৌকায় আসিতেছিলেন। পথে প্রবল ঝটিকা তাহাদিগের নৌকা আক্রমণ করিল। তরণী জলমগ্ন হইল। সঙ্গে সঙ্গে সতী ললনা পতি পুত্র রাখিয়া কুমারী কন্যার সহিত চিরদিনের জন্য গঙ্গার গর্ভে আশ্রয় লইলেন।

রামসুন্দরের প্রেরিত লোকের প্রাণ বাঁচিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া এই শোকবার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। কঠিন হৃদয় রামসুন্দরেরও বুক ভাঙ্গিয়া গেল। রামসুন্দর সংসার অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তাঁহার একমাত্র পুত্র তাহাকে সান্ত্বনা করা দূরে থাকুক বরং তাঁহার শোকাগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিল। ঐ পুত্র মাতার প্রতি বড়ই ভক্তিমান্ ছিল। তোমার পাপেই আমার মাতা ও ভগ্নীর অপমৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া সে রামসুন্দরকে জ্বালাইতে লাগিল। গৃহিণীর শ্রাদ্ধের দিনে সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া কোথায় চলিয়া গেল।

বিংশ অধ্যায়।

রামসুন্দরের পুত্র শ্রাদ্ধের দিন বাটীতেই ফিরিল না। রামসুন্দর নিজেই স্ত্রীর শ্রাদ্ধ সারিলেন। বরদাকান্ত এইরূপই ব্যবস্থা দিলেন। রামসুন্দর অল্প অল্প বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্রের মাতৃশ্রাদ্ধ করিবার ইচ্ছাই নাই। কিন্তু বরদাকান্তের নিকট তাহা প্রকাশ করিলেন না। শ্রাদ্ধের কয়েক দিন পরেই পুত্র বাড়ী ফিরিয়া আসিল। রামসুন্দর তাহাকে গোপনে শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে শাসনের বাহিরে গিয়াছে। পিতার প্রতিকথায় সে প্রতিবাদ করিতে লাগিল। রামসুন্দর এতদিন যাহা ভয় করিতেছিলেন, আজ তাহা সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারিলেন। তাঁহার পুত্রের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থাই নাই। ইহাতে রামসুন্দরের মনে বড়ই আঘাত লাগিল।

এক সময়ে মধু মণ্ডলের পুত্রের দু' একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বরদাকান্তের সহিত কতই হাসিয়াছেন। আর আজ তাঁহার পুত্র ব্রজগোপালকে অনেক ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। একদিন তিনি বলিয়া

ছিলেন, ব্রজগোপালের ন্যায় পুত্রকে আস্ত পুতে ফেলা উচিত। এখন নিজের পুত্রের বেলায় কি করিবেন তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইলেন। পুত্রকে কেন অধ্যয়নার্থে কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলাম? এই বলিয়া নিজেকে, নিজে, কতই ধিক্কার দিলেন। গৃহদাহ, পত্নীবিয়োগ, কন্যার মৃত্যু প্রভৃতি অপেক্ষা পুত্রের ধর্ম্মত্যাগই তাঁহার কাছে বিষম সমস্যা বলিয়া বোধ হইল। আবার গোল এই যে, একমাত্র সুহৃদ্ বরদাকান্তের কাছেও ইহা লুকাইতে হইবে।

কিন্তু রামসুন্দর যতই লুকাইতে চেষ্টা করুন না কেন, পুত্রের কিছুই গোপন করিবার চেষ্টা ছিল না। রামসুন্দরের ঔরসে যে সন্তানের উৎপত্তি, তাহাতে সদ্গুণের আশা করাই অন্যায়। মাতার মৃত্যুর পরেই পুত্র যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। যাহাতে পিতার মনে কষ্ট হয়, প্রতিকার্য্যই সে সেই ভাবে করিতে লাগিল। শাস্ত্রের কথা "পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণং" অন্বর্থ হইল।

রামসুন্দরের পুণ্যের লক্ষণ পুত্রে প্রকাশ পাইল। রামসুন্দর বড়ই বিপদে পড়িলেন। তাঁহার একমাত্র সম্পত্তি হিন্দুধর্ম্মের ভান। ত্রিলোচনের ন্যায় প্রকৃত ধাম্মিক তিনি ছিলেন না। সেই ধর্ম্মের ভান রাখিতে গেলে, সংসারের একমাত্র পুত্রকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিতে হয়। না করিলে লোকের নিকট কেমন করিয়া মুখ দেখাইবেন? এই জন্যই বলিয়াছি যে, রামসুন্দরের কাছে এ সমস্যা বড়ই বিষম বোধ হইল।

রামসুন্দর বাহিরে বসিয়া এই কথাই ভাবিতেছেন, এমন সময়ে বরদাকান্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামসুন্দরের পুত্রের কথাই উত্থাপিত হইল। রামসুন্দর আপনা হইতেই বুঝাইতে লাগিলেন, দেখুন ওটা কিছু নয়, আমি দেখ্‌লাম ওর ধর্ম্মে মতি ঠিকই আছে, দেব দ্বিজে ভক্তি আছে। তবে এদের মৃত্যুতেই বড় শোকটা পেয়েছে।

ভারী ভালবাসত তাদের। বল্লে যে শ্রাদ্ধ করতে বস্‌লেও আমি শ্রাদ্ধ কর্‌তে পার্ত্তাম না। এখনও সমস্ত দিনই কাঁদে।

ব। আমি তা বুঝ্‌তে পেরেছি। তবে গ্রামের লোককেও সেটা বুঝ্‌তে দেওয়া উচিত। আপনার উপর লোকের যা ভক্তি শ্রদ্ধা আছে, আপনার ধর্ম্ম ভাবই অনেকটা তার মূল।

রা। সে কথা আর মুখে বল্‌ব না। ভালয় ভালয় সেরে যেতে পার্লেই বাঁচি। জগদীশ্বর শেষকালে কি দুঃখটাই দিলেন।

ব। ও কিছু মনে কর্ব্বেন না। ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।

রা। তা ঠিকই—হরিবোল হরিবোল।

রামসুন্দরের পুত্র পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই রূপ কথোপকথন শুনিতে ছিল। সহসা কি মনে করিয়া সে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। ক্ষণেক পরে, ফিরিয়া আসিয়া, সে বাহিরের একখানি চালা ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। এক জন মুসলমান ঘরামী তখন সেই ঘরখানি ছাইতে ছিল। রামসুন্দরের পুত্র যেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, সেখান হইতে রামসুন্দর এবং বরদাকান্ত উভয়কেই দেখা যায়,এবং তাহাদের সহিত কথা কওয়াও চলে। সে সেই মুসলমান ঘরামীকে ডাকিল; সে চাল হইতে নাবিলে তাহার পৃষ্ঠে এক হস্ত দিয়া দাঁড়াইল, এবং অপর হস্তে আপনার জামার পকেট হইতে কতকগুলি ভাত বাহির করিয়া বরদাকান্তকে ডাকিল। সেই ভাত খাইতে খাইতে কহিল,—"খুড়ো ঠাকুর, এই দেখো, বাবার ধর্ম্মে আমার কেমন মতি আছে। চাপা দিলে কি হয়? আমি চাপা দিব না।"

পুত্রের কার্য্য দেখিয়া রামসুন্দরের মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি কি বলিবেন বা কি করিবেন তাহা কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না।

বরদাকান্ত 'রাম রাম; মহাভারত, মহাভারত', বলিয়া উঠিলেন।

রামসুন্দর অমনি কহিলেন,—"আর রাম রাম, মহাভারত ; কচ্ছেন কি ? দেখতে পাচ্ছেন না ও ক্ষেপে উঠেছে, বাঁধুন বাঁধুন। গোলামআলি ওরে বাঁধ্‌রে।" যে যবনীর গাত্র স্পর্শ করিয়া রামসুন্দরের পুত্র এই বিকট অভিনয় করিতেছিল, তাহার নাম গোলাম আলি।

গোলামআলি তাহাকে সহসা বাঁধিতে সাহস পাইবে কেন ?

রামসুন্দরের পুত্র কহিতে লাগিল,—"ক্ষেপেছ তুমি, আমি কেন ক্ষেপ্‌বো ?"

রামসুন্দর বকিতে আরম্ভ করিলেন "ওরে নির্ব্বংশের ব্যাটা, সাম্‌নে থেকে দূর হ।"

অনন্তর বরদাকান্তের দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"মাথা যে খারাপ হয়েছে তা' আমি ক'দিন থেকেই টের পেয়েছি। আপনাদের আর বলি নাই। ভগবান শেষকালে যে এত কষ্ট দিবেন, এ কখনও মনে ভাবি নাই।"

ব। উন্মাদের লক্ষণ ত বটেই। এখন রীতিমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

রা। আর চিকিৎসা, অমন পুত্র থাক্‌লো আর না থাক্‌লো।

ব। অমন কথা বলবেন না। অত্যন্ত শোকেতে অমন মাথা খারাপ হয়। একটু জ্ঞান হলেই আমি এসে উপদেশটেশ দেবো।

বরদাকান্ত বিদায় হইলেন। রামসুন্দর দেখিলেন পুত্রকে পাগল বলিয়া প্রচার করা ভিন্ন আর লোককে মুখ দেখাইবার উপায় নাই। সেই দিন রাত্রিতেই তিনি কিন্তু পুত্রের প্রতি প্রহার ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন। পর দিন প্রভাতেই সে বাড়ী হইতে প্রস্থান করিল।

একবিংশ অধ্যায়।

১২—সালের ৭ই পৌষ শুক্রবার অপরাহ্ণে তমলুকে, ভীমার বাড়ীর সম্মুখে, রাজপথে, এক অতি শোকাবহ আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছিল। সংসারে মানব মাত্রের মৃত্যুই অল্প বা অধিক শোকাবহ সন্দেহ নাই। কিন্তু একের মৃত্যুতে ও অন্যের মৃত্যুতে প্রভেদ আছে। এক দরিদ্র পরিবারের একমাত্র উপার্জ্জন-শীল ব্যক্তির মৃত্যু এক কথা, আর বহু-লোক পূর্ণ বৃহৎ সংসারের এক শিশুর মৃত্যু আর এক কথা। আবার ধনী ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে মৃত্যুতে বিস্তর প্রভেদ। সংসারে এমন মৃত্যুও হয় যে কোন ধনশালী পরিবারের কর্ত্তা মানবলীলা সংবরণ করি-লেন, তাহার পুত্র কিংবা কনিষ্ঠ ভ্রাতা, 'আপনার হাতে কর্তৃত্ব-ভার আসিল, বিলাস, বিহার, উপভোগ করিবার পথ পরিষ্কার ও নিষ্কণ্টক হইল' ভাবিয়া মনে মনে যেন সন্তুষ্টই হইলেন। সদন্তঃকরণে আত্মী-য়ের মৃত্যুতে সন্তোষ আসিতে পারে না সত্য; কিন্তু রাজ্যৈশ্বর্য্য লাভের

নিমিত্ত অনেকে পিতা পিতৃব্য ভ্রাতা প্রভৃতিকে হত্যা করিয়াছেন, মানব ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। সুতরাং এ মৃত্যুকে শোকের কারণ না বলিয়া সুখের কারণ বলা যাইতে পারে।

তবে এ কথা সত্য যে সংসারে দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত লোকের সংখ্যাই অধিক। পৃথিবীতে এমন লোকই অনেক যাহাদের মৃত্যু তাহাদের পরিবারস্থ কেহই কামনা করেন না। অথচ হয়ত একটি লোকের মৃত্যুতেই একটি সংসার ধসিয়া যায়, সমগ্র পরিবার অনাথ ও অন্নহীন হয়। এইজন্য নিম্ন বা মধ্য শ্রেণীর লোকের মধ্যে অধিকাংশ মৃত্যুই অতি শোকাবহ, বড়ই হৃদয়-বিদারক। হৃদয় থাকিলে এমন মৃত্যুর বিবরণ শুনিয়াও অশ্রু সংবরণ করা যায় না। আমরা পাঠককে এইরূপ একটি মৃত্যুর কথা শুনাইতেছি।

কোন এক হিন্দু যুবক মধ্য বঙ্গ রেল পথের খুলনা ষ্টেষনে টিকেট সংগ্রহ করা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মাতা এবং স্ত্রী ভিন্ন সংসারে তাহার আর কেহ ছিল না। যুবক তাহাদিগকে লইয়া ষ্টেসনের নিকটে এক ক্ষুদ্র বাড়ীতে থাকিতেন। কয়েক বৎসর গত হইল, এক দিন বেলা এগারটার সময়ে সেই ষ্টেষনে একখানি গাড়ী আসিয়া থামিল। উপরোক্ত যুবক তখন আহার করিতে যাইতেছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ভাত দিয়াছেন, জননী তাঁহাকে আহার করিবার জন্য ডাকিতেছেন, এমন সময়ে গাড়ীর শব্দ পাওয়া গেল।

অন্যান্য দিন তিনি ভাত খাইয়াই এ গাড়ীর টিকেট সংগ্রহ করিতেন। সে দিন ভাত হইতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া আহারের পূর্ব্বেই গাড়ী আসিয়া পঁহুছিল। যুবক জননীকে কহিলেন, "মা আমি এই টিকেট কখানা কুড়িয়ে এসেই ভাত খাচ্ছি।" মাতা অন্ন কোলে করিয়া বসিয়া রহিলেন। যুবক যখন ষ্টেষনে আসিয়া পঁহুছিলেন, তখনও

গাড়ীর বেগ ছিল। তিনি একখানি গাড়ীর সোপানে পা দিতে যাইতেই তাঁহার পদ স্খলন হইল। রেলপথের উপর পড়িয়া গেলেন। পশ্চাদ্বর্ত্তী গাড়ীগুলি তাঁহার শরীর হইতে পা টি বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেল। রুধিরের নদী ছুটিল। ষ্টেষনের কয়েকটি ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। কেহ বস্ত্র দ্বারা তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আবৃত করিলেন। কেহ মস্তকে জল সেক করিতে লাগিলেন। কেহ বা ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দিলেন। কিন্তু শুশ্রূষায় আর কি হইবে? পা কাটিবার পর হইতে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যুবকের জীবনী শক্তির লোপ হইতেছিল। প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার পূর্ব্বে যে দু'চারিটি কথা বলিতে পারিয়াছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার জননী এবং স্ত্রীর সম্বন্ধে।

অভাগিনী জননী তখনও ভাতের থালা সম্মুখে রাখিয়া পুত্রের প্রতীক্ষা করিতেছেন। স্ত্রী স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট আহার করিবেন বলিয়া বসিয়া আছেন। সংসারের একমাত্র অবলম্বন, যুবকের পতন সংবাদে তাঁহারা স্ত্রীজনসুলভ লজ্জা ভুলিয়া রাস্তায় আসিয়া ধূলায় পড়িয়া যখন কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, তখন মানুষ কেন, নিকটস্থ পশু পক্ষীরাও যেন ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়াছিল। অপরিচিত পথিকেরাও কিছু কালের জন্য পথ ভুলিয়া সেখানে দাড়াইয়া ছিলেন। আমাদের যে হৃদয়বান্ প্রিয় সুহৃদ্ এই ঘটনা স্থলে উপস্থিত ছিলেন, এবং যিনি উদ্যোগ, যত্ন ও সাহায্য করিয়া মৃত যুবকের অসহায় জননী ও বিধবা রমণীকে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, মুখে ইহা বিবৃত করিতে করিতে তাঁহার দু তিনবার কণ্ঠরোধ হইয়াছিল। আমরাও চক্ষের জলে কাগজ ভিজাইয়া চিত্রটি অঙ্কিত করিলাম। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, পাঠককে যেন কখনও এমন দৃশ্য স্বচক্ষে না দেখিতে হয়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

আমরা তমলুকের যে মৃত্যুটির কথা বলিতেছিলাম, তাহা ঠিক এই-রূপ না হইলেও এই শ্রেণীর বটে। মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধন নিমিত্ত যতই নূতন নূতন কল কৌশলের আবিষ্কার হইতেছে, জগতে আকস্মিক মৃত্যুর সংখ্যাও ততই বাড়িতেছে। কতকগুলি লোক তমলুকের পাকা রাস্তায় একটি রোলার টানিতেছিল। ইহাদের সঙ্গে দুইটি বালক ছিল। একটির বয়স দশ আর একটির দ্বাদশ বৎসর মাত্র। ভীমার বাড়ীর নিকটে আসিতেই একটা বিষম শব্দ উঠিল। রোলার টানা বন্ধ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সেখানে শতাধিক লোক জমিয়া গেল। দশ বৎসরের বালকটি টানিতে টানিতে হস্ত শিথিল হওয়ায় সহসা রোলারের দণ্ডটি ছাড়িয়া দিয়াছে। অন্যান্য লোক গুলি রোলারটি থামাইতে থামাইতে বালক তাহার নীচে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাই-য়াছে। তাহার মস্তকটি একবারে পিষিয়া গিয়াছে। একখানি হস্তের অস্থি হইতে মাংস ও চর্ম্ম পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।

মুহূর্ত্ত মধ্যে ভাইটিকে জন্মের মত হারাইয়া দ্বাদশবর্ষীয় বালক যখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, তখন রাস্তার অনেক লোকই তাহাকে সান্ত্বনা করিতে অগ্রসর হইল। নিকটস্থ বিপণি গুলিতে ক্রয় বিক্রয় বন্ধ হইয়া গেল। বালক যখন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "ওগো আমার মার আমরা দুটি ভাই ছাড়া আর কেহ নাই, আমি কেমন ক'রে যেয়ে এ কথা মাকে বল্‌বো," তখন সমাগত সকলের চক্ষেই জল আসিয়াছিল। বালকের কান্না শুনিয়া বাজারের কতকগুলি বেশ্যা সেখানে আসিয়াছিল। তাহারা সকলেই মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহারাও ত মানুষ। যতই কেন পাপ পঙ্কে ডুবুক না কেন, স্ত্রী-জন সুলভ কোমলতা হৃদয় হইতে একবারে বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই।

যে লোক গুলি রোলার টানিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন প্রৌঢ় শ্রমজীবী বালকটির সঙ্গে সঙ্গে বড়ই কাঁদিতেছিল। সমাগত লোকেরা তাহাকে মৃত বালকের আত্মীয় জ্ঞানে তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিল,—"হ্যাগা ও ছেলেটির আর কে আছে?" সে উত্তর করিল,—"থাকবার মধ্যে এক মা, আর ঐ ভাই যাকে দেখ্‌ছেন। বাপ ম'রে যেতে ওদের মা ছেলে দুটিকে নিয়ে এসে আমাদের গ্রামে ভাই এর বাড়ীতে ছিল। কপাল ক্রমে সে ভাইটিও মারা গেছে—সে এখানেই এক বাবুর বাসায় চাকর ছিল। কিছু নাই, মা—বেটী লোকের বাড়ীতে ধান টান ভানে। বড় ছেলেটা আমার সঙ্গে সহরে কাজ টাজ করে, আজ ক'দিন থেকে ঐ ছোট ছেলেটাকেও দিচ্ছে, সারা দিন খেটে আটটি পয়সা পেত। আজ জন্মের শোধ মাকে পয়সা দিয়ে গেল।" শ্রমজীবী আর স্পষ্ট কথা কহিতে পারিল না—"ওর মা এসে আমাকেই ধর্‌বে এখন" বলিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল। অবস্থা শুনিয়া দর্শকদিগের অনেকেরই প্রাণ গলিয়া গেল। মৃত বালকের

ভ্রাতার সাহায্যার্থে তাহারা সকলেই কিছু কিছু দিতে চাহিল। বেশ্যারাই প্রথমে পথ দেখাইল। তাহাদের কেহ একটি সিকি, কেহ একটি আধুলি, কেহ বা একটি টাকা লইয়া আসিল।

বালককে তাহা দিতে গেলে সে "ওগো আমি টাকা পয়সা চাই না, তোমরা আমার ভাইকে বাঁচাইয়া দেও" বলিয়া ভূমিতে পড়িয়া চেঁচাইতে লাগিল। সেই শ্রমজীবী তাহার হইয়া সমস্ত কুড়াইয়া লইল।

কিন্তু পরের জন্য, পরে আর কতক্ষণ কাঁদিবে? বালকের মৃত্যুতে তাহার মাতার এবং ভ্রাতার যাহা হইল, অন্য লোকের তাহা হইবে কেন? ইহাতে অন্যের যে ক্ষণিক কার্য্য ক্ষতি, বা সামান্য অর্থ ব্যয়, সে কেবল মানুষের মনুষ্যত্ব আছে বলিয়া। ক্রমে ভিড় কমিয়া আসিল। দর্শকেরা যে যাহার কাজে চলিয়া গেল। মনুষ্যত্ব বিহীন মিউনিসিপালিটির মড়া-বাহক আসিয়া তম্বি করিতে লাগিল,—"হয় তোমরা মড়া তুলিয়া লইয়া যাও, না হয় সরে যাও, আমি নিয়ে ফেলে দি।" সেই প্রৌঢ় শ্রমজীবী তাহাকে বিনয় করিয়া কহিল,—"ওর মাকে আন্‌তে লোক পাঠিয়েছি, সে এসে একবার দেখুক, একটু অপেক্ষা কর, তোমাকে আর ছুঁতে দেব না, আমরাই নিয়ে যাব এখন।"

ক্ষণকাল পরেই বালকের জননী উন্মাদিনীর বেশে আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ক্রন্দনে পুনরায় লোক জমিতে আরম্ভ হইলে, শ্রমজীবিগণ তাঁহাকে সেখানে থাকিতে দিল না। এই সময়ে পুলিস আসিয়া তাহাদের কার্য্য শেষ করিয়া শব জ্বালাইবার অনুমতি দিয়া গেল। শ্রমজীবিগণ মৃত দেহ স্কন্ধে ফেলিয়া হরিবোল বলিতে বলিতে শঙ্কর আড্ডা পার হইয়া সহরের দক্ষিণে শ্মশানাভিমুখে চলিল। জননী পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। "ওরে বাবা, তুই আমার দুধের শিশু,

আমার ঘরে কিছু থাক্‌লে কি আমি তোরে এমন কাজ কর্ত্তে পাঠাই বাবা? আজ যখন বাড়ী থেকে বেরুস্ তখনই বাধা পড়েছিল, বাবা, আমার বারণ না শুনে তুই চলে এলি, বাবা, আর ত ঘরে ফির্‌লিনে বাবা, একবার মা বলে কোলে আয় বাবা, কেন এ রাক্ষসীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলি বাবা, আমি পয়সার জন্যে তোকে মেরে ফেল্লাম বাবা ;" এমনই কত কথা বলিয়া অভাগিনী জননী কাঁদিতে লাগিলেন।

মৃত বালক যে ধনঞ্জয়ের কনিষ্ঠ পুত্র মাধব, ইহা পাঠককে বলিবার প্রয়োজন আছে কি?

অনাথা অসহায়া রমণীর সংসারের অবলম্বন ছিল দুইটি পুত্র। তাহার একটি এইরূপে চলিয়া গেল। সংসারে কাহারও দশ বৎসর বয়স্ক পুত্রের জন্য দাস দাসী নিযুক্ত। এখানে দরিদ্র বিধবার দশ বৎসরের পুত্রই উদরান্নের জন্য যুবজনোচিত পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইয়াছিল। রমণী এ জীবনে এমন কি পাপ করিয়াছে, যাহাতে সে পতিশোক, ভ্রাতৃশোক, এবং পুত্রশোক পাইতে পারে? বিশ্ব পিতার বিশ্ব রাজ্যে এমন মৃত্যু কেন হয় কে বলিবে? বালক যে সেই দিন মরিবে ইহাই বা কে জানিত? মঙ্গলময় জগদীশ্বর মানুষের মঙ্গলার্থই তাহাকে মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটন করিবার ক্ষমতা দেন নাই।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

পাঁচ ছয় বৎসরে রামসুন্দরের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বলিয়া দিতে হইবে না যে, তিনি ক্রমশঃ অবনতির দিকেই যাইতেছেন। সে রামসুন্দর আর নাই। একমাত্র পুত্রকে পাগল বলিতে বলিতে তিনি পাগলই করিয়া তুলিয়াছিলেন। দু' তিন বৎসর হইল, কলিকাতায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাহীন রামসুন্দর এখন একাকী। অল্প দিন হইল তাঁহার শরীরে কুষ্ঠরোগ দেখা দিয়াছে। রামসুন্দর পঞ্চ তিক্ত ঘৃত প্রভৃতি কবিরাজী ঔষধ ব্যবহার করিতেছেন।

রামসুন্দরের প্রিয় ভৃত্য আবদুল জেলেই ভুগিয়া ভুগিয়া মরিয়াছে। গোপাল এক জাল করা অপরাধে জেলে গিয়াছিল। কারাবাসে থাকিতে থাকিতে এক কুৎসিত অপরাধ করায় চিরজীবনের জন্য দ্বীপান্তরিত হইয়াছে।

রামসুন্দরের বাড়ীর অবস্থা এখন বড়ই শোচনীয়। আত্মীয় বলিতে সংসারে তাঁহার কেহই নাই। গ্রামের লোকের সহানুভূতি

পাইবেন এমন কাজ তিনি জীবনে বড় কিছু করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে ত্রিলোচনের ন্যায় দেবচরিত্র কেহ থাকিলে, তিনি, হয়ত, এ সময়ে রামসুন্দরের ক্লেশ দেখিয়া ব্যথিত হইতেন। অবস্থা বুঝিয়া ভৃত্যেরাও রামসুন্দরকে পূর্ব্বের ন্যায় ভয়-ভক্তি করিত না। মহারোগ-গ্রস্ত বলিয়া কেহ সাধ্যমত তাঁহার নিকটস্থই হইত না।

গ্রামের একটী দরিদ্র বিধবা স্ত্রীলোক রামসুন্দরকে দুটী রাঁধিয়া দিত। কিন্তু সেও যতদূর সম্ভব দূরে থাকিত। রন্ধনের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে প্রায়ই রামসুন্দরের বাড়ীতেই আসিত না। ফলতঃ এক সময়ের প্রবল প্রতাপান্বিত, গ্রামের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা রামসুন্দর আজি কালি যেমন অসহায় অবস্থায় বাস করিতেছিলেন, কোন দরিদ্র গৃহস্থেরও তেমন অবস্থা নহে।

ক্রমে রামসুন্দরের আর্থিক অসচ্ছলতা হইয়া আসিল। রামসুন্দর নিজে এখন বাড়ীর বাহিরে যাইতে পারেন না।

অন্যায় উপার্জ্জনের পথ একেবারেই বন্ধ হইয়াছে। লোকে এখন তাঁহার ন্যায্য পাওনাও অনেক সময়ে দেয় না। রামসুন্দর একটী প্রজাকে তিন বার ডাকিলে হয় ত সে একবার আসিয়া দেখা করে। রামসুন্দরের মুখে জোরের কথা আর নাই। মিষ্ট কথায় একটি অনুরোধ করিলেও অনেকে তাহা অগ্রাহ্য করে। তাঁহার জীবনের এক মাত্র মন্ত্রই ছিল অর্থ। মানুষের প্রতি অত্যাচার করিয়া তিনি জীবনে যে সমুদয় অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, গৃহদাহ, মোকদ্দমা-ব্যয় প্রভৃতি না হইলে তাহাতেই তিনি রাজার মত কাটাইয়া যাইতে পারিতেন।

কিন্তু এ সময়ে [illegible] সঞ্চিত অর্থ অল্পই ছিল। তাই প্রজা এবং অধমর্ণগণের নিকট [illegible] আদায় না হইলে. তাঁহার আর্থিক অসচ্ছলতা

হইবারই কথা। ফলতঃ অল্পদিনেই রামসুন্দরের অর্থের অভাব হইল। তালুকাদি রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামসুন্দরের গ্রামের লোক দেবস্বভাব নহে। রামসুন্দরের অত্যাচার অনেকের হাঁড়ে হাঁড়ে বিঁধিয়াছিল। এখন ঠিক বিপরীত আচরণ আরম্ভ হইল। রামসুন্দরের প্রতি অত্যাচার হইতে লাগিল। পাঠক জানেন রামসুন্দর পাকা বাড়ী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরই তাঁহার উপর বিপদরাশি পতিত হওয়ায় বাড়ী শেষ হয় নাই। একটীমাত্র ঘর হইয়াছে। অট্টালিকার উপকরণ ইষ্টক, চূর্ণ প্রভৃতি সমস্তই প্রস্তুত ছিল। কড়ি, বরগা, কপাট, চৌকাট ইত্যাদি সকলই তৈয়ারি হইয়াছিল। রামসুন্দর একদিন চাহিয়া দেখেন, ইটগুলির উপর ঘাস গজাইয়া গিয়াছে। চূণগুলি মাটিতে মিশিয়া যাইতেছে। আর কাঠের জিনিসের অর্দ্ধেকেরও অধিক অপহৃত হইয়াছে।

রামসুন্দর চাকরদিগকে ডাকাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কাঠ কি হইল ?"

ভৃত্যেরা উত্তর করিল "আমরা কেমন ক'রে বল্‌ব ? রাত্রে রাত্রে বোধ হয় মান্‌ষে নিয়ে যায়"।

রা। তবে তোরা আছিস্ কি জন্তে ?

ভৃ। আমরা কাউকে কিছু বল্লে গ্রামের লোকে আমাদিগকে ঠেঙ্গিয়েই মেরে ফেল্‌বে।

রামসুন্দরের চাকর দুটী অন্য গ্রামের। তাহাদিগকে গ্রামের লোককে ভয় করিয়াই চলিতে হইত। রামসুন্দর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, একটী ভৃত্যকে থানায় এজাহার দিতে পাঠাইলেন।

পরদিন বেলা দুই প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দারগা বাবু মোকদ্দমা

তদন্ত করিতে আসিলেন। রামসুন্দর দারগা বাবুর আহারের বন্দোবস্ত যথেষ্ট করিয়াছিলেন। মাধ্যাহ্নিক ভোগ সরিলে, দারগা বাবু আল-বোলায় তাম্রকুট উপভোগ করিয়া শয়ন করিলেন। পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমিক প্রথানুসারে চৌকীদার পা টিপিয়া দিল। দু' তিন ঘণ্টা নিদ্রা লাভের পর অপরাহ্নে দারগা বাবু বার দিয়া বসিলেন।

আর্থিক অসচ্ছলতা নিবন্ধন রামসুন্দর তাঁহার পূজার আয়োজন বিশেষরূপে করিতে পারিলেন না। দু'এক কথাতেই দারগা তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, মোকর্দ্দমার কিনারা হইবে না নিশ্চিত বুঝিলেন।

চৌকীদারকে চুরি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন।

চৌকীদার চতুর ছিল। দারগা বাবুর পূজার ব্যবস্থা হয় নাই সে বুঝিতে পারিয়াছিল। গ্রাম থেকেই তাঁকে কিছু দেওয়াইয়া দিবে এই-রূপ ইঙ্গিতও সে সঙ্গীয় কনষ্টেবলকে করিয়াছিল। সে বলিল—

হুজুর এ চুরির কি কিনারা হয়? এত বড় বড় কাট যদি কেউ নিয়েও থাকে তা কি আর আস্ত রেখেছে? এত দিনে পুড়িয়ে মেরে দিয়েছে। আর ওঁর গোনবারও ভুল হতে পারে।

রামসুন্দর কহিলেন "তুইই বলনা, কত দোর, জানলা, কড়ি, বরগা এখানে দেখেছিস্।"

চৌ। সে ত দেখেছি। আপনি যেমন দশ জনের সর্ব্বনাশ ক'রে এক যায়গায় গুছিয়ে ছিলেন, আবার হয়ত সেই দশ জনের বাড়ীতেই যেয়ে উঠেছে [illegible]

রামসুন্দর [illegible] উদ্দেশ করিয়া কহিলেন "শুনলেন আপনার চৌকীদারের [illegible]

দারগা কি[illegible] একটু মুচকি হাসিলেন। অর্থ এই যে, না

বলেছে ঠিকই বলেছে। তিনি রামসুন্দরের পূর্ব্বজীবন জানিতেন। ক্ষণেক বাদে, দারগা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কাউকে বিশেষ সন্দেহ করেন?

রা। আমি গ্রামের সকল লোককেই সন্দেহ করি।

দা। তাহ'লেই আপনার মোকর্দ্দমা হয়েছে। ওঠ্‌রে ওঠ্‌, চল রাত্রে ভড় ভড়ার বদমাইস গুলির বাড়ী তদন্ত ক'রে যেতে হবে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দারগা চলিয়া গেলেন। তদন্তের কি ফল হইল, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে কেন?

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

পিতৃহীন, ভ্রাতৃহীন যাদবের কি হইল জানিবার জন্য পাঠকের ঔৎসুক্য থাকিতে পারে। মাধবের মৃত্যুর কিছুকাল পরে যাদব গ্রামের একটি লোকের সহিত কলিকাতায় আসিল। ঐ লোকটীর গঙ্গার ধারে একটি ফলের দোকান ছিল। যাদব তাহাতেই কাজ করিতে লাগিল। আহারাদি ব্যতীত যাদব মাসিক দুইটি টাকা বেতন পাইত। সে তাহাই জননীকে পাঠাইয়া দিত। কাজ কর্ম্ম করিয়াও যাদবের যে একটু সময় থাকিত, সে তখনই অনুসন্ধান করিত, কিসে জীবনের একটু উন্নতি করিতে পারে। কলিকাতায় আসিবার দু' বৎসর পরেই যাদব এক নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করিল। সে দেখিল তাহার পরিচিত দুই একটি লোক বড় বাজার হইতে খাবার কিনিয়া তাহা সহরে ফিরি করিয়া বেচে, এবং ইহাতে প্রতিদিন কম হইলেও আট আনা দশ আনা লাভ হয়। যাদব তাহার অনুগ্রাহকের অনুমতি লইয়া এই কাজ করিতে লাগিল। ইহাতে অধিক মূলধনের প্রয়োজন নাই। প্রতিদিন পাঁচ ছয় টাকার খাবার

কিনিলেই যথেষ্ট হয়। এক টাকার খাবার বিক্রয় করিতে পারিলে, তাহাতেই তিন চারি আনা লাভ হয়। আবার কিছু অবিক্রীত থাকিলে সন্ধ্যাকালে তাহা আনিয়া দোকানে ফিরাইয়া দেওয়া চলে। পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই যাদব দেখিল মাকে রীতি মত সাহায্য করিয়াও তাহার হাতে প্রায় পঞ্চাশ টাকা জমিয়াছে। যাদবের অপব্যয় ছিল না। পল্লী গ্রামের যে সমস্ত সাধারণ লোক কলিকাতায় আসিয়া ফিরিওয়ালার ন্যায় নীচ কাজ করে, অল্প মাত্র বুদ্ধি থাকিলেও তাহারা প্রত্যেকে মাসে ১৫।২০ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। তবে সহরের প্রলোভন অনেক অধিক। চরিত্র বল না থাকায় এই শ্রেণীর লোক সহজেই বাবু হইয়া যায়। দিনের বেলায় বাবুগিরি করিবার পথ না থাকায় সন্ধ্যার পরে বা রাত্রিতে ইহাদের পায়ে জুতা ওঠে; মাথায় চিরুণি পড়ে। ক্ষুদ্র খোলার ঘরের বাসাতেই তবলার ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। ফল এই দাঁড়ায় যে ইহারা যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা কলিকাতাতেই রাখিয়া যায়। বাড়ী যাইবার সময় ইহারা কেবল বাবুগিরির ঝোঁক টুকু লইয়া ঘরে ফেরে। অনেককে বাড়ী ফিরাইয়া লইতে পিতা মাতা বা প্রতিবেশী কাহাকেও কলিকাতা আসিতে হয়। যাদব এ শ্রেণীর লোক নহে। তাহার একমাত্র সংকল্প যেরূপে পারি মানুষ হইব; মা'র কষ্ট ঘুচাইব। কলিকাতায় আসিয়া অবধি সে একটী পয়সাও অপব্যয় করে নাই।

দু'তিন বৎসর পরে যাদব দেখিল সে নিজেই একটি খাবারের দোকান করিতে পারে। একটি ছোট ঘর ভাড়া লইয়া সে তাহাই করিল। অল্প দিনেই তাহার দোকানের নাম প্রকাশ হইল। যাদব লোককে ঠকাইত না। ইচ্ছা করিয়া সে খারাপ জিনিষ ব্যবহার করিত না। যে একবার তাহার দোকান হইতে খাবার লইত, প্রয়োজন হইলে সে পুনরায় সেখানেই আসিত।

পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যেই তাহার আয় বেশ বাড়িয়া উঠিল। যাদব কারবারও বড় করিল। দোকানের সমস্ত কাজ নিজে করিতে পারে না বলিয়া সে প্রথমতঃ একজন চাকর রাখিয়াছিল; এখন আরও দুইজন চাকর রাখিল। পার্শ্বের আরও দু'টী ঘর ভাড়া লইল। নিকটস্থ এক বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে মাকে লইয়া আসিল। মাতা তাহার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। দেশের কোন সম্রান্ত বংশের এক কন্যার সহিত যাদবের বিবাহ হইল। পুত্রের উন্নতি দেখিয়া ধনঞ্জয় পত্নীর আহ্লাদের সীমা রহিল না।

সৎপথে থাকিলে এবং অমিতব্যয়ী না হইলে অতি সামান্য উপার্জ্জনের পথ হইতেও মানুষ কেমন উন্নতি লাভ করিতে পারে, যাদবের জীবন তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। দোকান করিবার পর দশ বৎসরের মধ্যে যাদবের এমন অবস্থা হইল যে, সে তখন দশ সহস্র মুদ্রা সঞ্চয় করিয়াছে। যাদবের মাতা অনুরোধ করিলেন "বাবা দেশের সেই ভিটাটা উদ্ধার করতে চেষ্টা কর।"

নৃশংস রামসুন্দর যাদবের মাতাকে যে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিয়াছিলেন, যাদবের তাহা মনে ছিল। মার আদেশে যাদব গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থার সন্ধান লইল। অল্প দিনের মধ্যেই সে জানিতে পারিল, রামসুন্দরের জীবনেই তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। জোত জমি তালুকাদি প্রায়ই গিয়াছে। মধু মণ্ডলের পুত্র ব্রজ গোপাল ত্রিলোচনের জমাটী খরিদ করিয়াছেন। ব্রজ গোপালের অপেক্ষাও যাদবের টাকা অধিক।

যাদব অল্প দিনেই নিজের পৈত্রিক ভিটা এবং সঙ্গে সঙ্গে রামসুন্দরের অবশিষ্ট জমিজমা ও বাড়ী খরিদ করিল। যে জমিতে তাহার জননী পাপিষ্ঠ রামসুন্দরের নিষ্ঠুর পাদুকাঘাত সহ্য করিয়াছিলেন, কেবল সেই

জমিটী খাসে রাখিয়া যাদব অন্য সমস্ত জমিই গ্রামের প্রজাদিগকে বিলি করিয়া দিল। যাদবের আর পল্লীগ্রামে যাইয়া বাস করিবার ইচ্ছা নাই।

যে রমণী, দুইটি ধানের জন্য একদিন পাষাণ হৃদয় রামসুন্দরের চরণোপরি পতিত হইয়াছিলেন, এখন তিনি পুত্রের পয়সায় নিত্য নিত্য গাড়ী করিয়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে যান; আর ইচ্ছামত গরীব দুঃখীকে দু' একটি পয়সা বা সিকি দুয়ানিও দান করিয়া থাকেন।

উপসংহার।

অতঃপর রামসুন্দরের কি হইল, তাহা কি আর বলিবার প্রয়োজন আছে? রামসুন্দর এখন দয়ার পাত্র। তাঁহার শেষ জীবনের দুঃখ দুর্গতি বর্ণনা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থ আমরা সংক্ষেপে দু' চারি কথা কহিব।

ক্রমে রামসুন্দরের পক্ষে জীবনের ভার বহন করা অসহ্য হইয়া উঠিল। জমিজমা সমস্ত গেল, ভূস্বামী তাঁহার ঘর বাড়ী প্রভৃতি বিক্রয় করিলেন। যাদব তাহা খরিদ করিল, ইহা পূর্ব্বাধ্যায়েই উক্ত হইয়াছে। জমিদারের প্রাপ্য শোধ হইয়া রামসুন্দর যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পাইলেন তাহাই লইয়া কাশীতে যাইবার উদ্যোগ করিলেন।

রামসুন্দরের অবস্থা দেখিয়া, ব্রজগোপাল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখিত হইলেন। ব্রজগোপাল কর্ম্ম স্থলেই থাকিতেন। বৎসরান্তে বা দু' বৎসর পরে এক একবার বাড়ী আসিতেন। রামসুন্দর সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কাশী যাত্রা করিবার কিছুকাল পূর্ব্বেই তিনি একবার বাড়ী আসিয়াছিলেন।

ব্রজগোপালের অবস্থা এখন বেশ ভাল, তিনি মণ্ডল বাড়ীর পূর্ব্বশ্রী

ফিরাইয়া আনিয়াছেন। রামসুন্দরের কাশী যাত্রার সময়ে তিনি কিছু অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন, এবং নিজে তাহা না বলিতে পারিয়া এক তৃতীয় ব্যক্তিকে দিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন। রামসুন্দর তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

কাশীতে পঁহুছিয়াই রামসুন্দর ত্রিলোচনের দর্শন পাইলেন, উঁহাকে কেমন করিয়া মুখ দেখাইব ভাবিয়া তিনি অন্যত্র যাইতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু ত্রিলোচন তাঁহার অবস্থা দেখিয়া, পূর্ব্ব কথা সমস্ত ভুলিয়া গেলেন, এবং এক সঙ্গে থাকিবার জন্য এমন ভাবে অকপট আগ্রহ প্রকাশ করিলেন যে,রামসুন্দর তাঁহার অনুরোধ কোনমতেই এড়াইতে পারিলেন না। ত্রিলোচন এত দিন বাঁচিয়া আছেন, এবং কাশীতে আছেন, ইহা তিনি জানিতেন না। দু' এক কথার পরেই তিনি জানিতে পারিলেন ত্রিলোচনের হস্তস্থিত সামান্য অর্থ নিঃশেষিত হইবার পর ব্রজগোপাল তাঁহার কাশী বাসের ব্যয় যোগাইতেছেন। রামসুন্দর মনে মনে ব্রজ-গোপালের মহত্ব আলোচনা করিয়া বিস্মিত হইলেন।

ত্রিলোচন ঠিক সহোদরের ন্যায় কুষ্ঠরোগগ্রস্ত রামসুন্দরের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কথায় কিংবা কার্য্যে তিনি কখনও জানিতে দেন নাই যে, তাঁহার পূর্ব্ব কথা মনে আছে। কাশীতে তাঁহার পরিচিত লোকের কাছে তিনি তাঁহাকে গ্রাম সম্পর্কের ভাই বলিয়া পরিচয় দিতেন। কিন্তু তিনি যেন বারাণসী ধামে বসিয়া রামসুন্দরের আগমনই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। হতভাগ্য রামসুন্দরের অদৃষ্টে ত্রিলোচনের ন্যায় সাধুর সংসর্গ লাভ অধিক দিন ছিল না। তিনি কাশীতে আসিবার পর এক মাস যাইতে না যাইতেই ত্রিলোচনের কাশী প্রাপ্তি হইল। ত্রিলোচনের সঙ্গ হারাইয়া রামসুন্দর যত কাঁদিলেন, আপনার পুত্র-কন্যা-ভার্য্যা বিয়োগেও তিনি তত কাঁদেন নাই।

এদিকে রামসুন্দরের অর্থ ফুরাইয়া আসিল। তিনি যত শীঘ্র মৃত্যুর আশা করিয়াছিলেন, তাহা হইল না। রামসুন্দর মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, এখন রাস্তায় বসিয়া ভিক্ষা না করিলে আর উপায় নাই। এমন সময়ে তিনি ব্রজগোপালের এক পত্র পাইলেন। তিনি লিখিয়াছেন—'(ত্রিলোচন) দাস জ্যাঠার কাশী প্রাপ্তি হইয়াছে। আপনি কাশীতেই রহিয়াছেন। অর্থাভাবে পাছে আপনার কাশী বাসের কষ্ট হয়, এই ভাবিয়া লিখিতেছি যে, যদি আপনি গ্রহণ করিতে আপত্তি না করেন, তাহা হইলে আমি দাস জ্যাঠাকে যেমন মাসিক পাঁচ টাকা পাঠাইতাম, তেমনি আপনাকেও প্রতি মাসে তাহা পাঠাইয়া দিব। আপনি দেশে থাকিতে আমার সাহায্য গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন, তাই আমি ভয়ে ভয়ে লিখিলাম। আমি আপনার সম্পর্কিত আপনার অগ্রজের জামাতা, অতএব আবশ্যক হইলে আমার এই সামান্য সাহায্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।'

এই অযাচিত অনুগ্রহ উপেক্ষা করিবার দিন রামসুন্দরের আর নাই। তিনি পত্রোত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া ব্রজগোপালকে লিখিলেন,—'যদি পরম পাপীর আশীর্ব্বাদে বা প্রার্থনায় কিছু ফল থাকে তাহা তুমি পাইবে।'

আর লিখিবার কিছুই নাই। দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারী দরিদ্রের শোণিত শোষণকারী, ধর্ম্মের বাহ্যিক আবরণধারী রামসুন্দরকে গলিত কুষ্ঠরোগগ্রস্ত অবস্থায় কাশীতে রাখিয়াই আমরা গল্পের উপসংহার করিলাম। রামসুন্দরের অদৃষ্টে কাশী প্রাপ্তি ঘটে নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাকে যে বিষম কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং যে ভাবে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল আমরা তাহা বর্ণনা করিতে [illegible]।

সম্পূর্ণ।